ইসলামী আদাবে জিন্দেগী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

ইসলামী আদাবে জিন্দেগী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.bjilibrary.com

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৪৭১১৫১৯১, ০২-২২২২২৯৪৪২
www.adhunikprokashoni.com
Email : adhunikprokashoni@yahoo.com
facebook.com/adhunikprokashoni

ISBN-978-984-416-036-1

আ. প্র. ৪১৭

প্রথম প্রকাশ : ২০১১

৬ষ্ঠ প্রকাশ

জমাদিউল আউয়াল	১৪৪৫
অগ্রহায়ণ	১৪৩০
নভেম্বর	২০২৩

বিনিময় : ৯৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISLAMI ADABE JINDAGEE. by Mawlana Matiur Rahman Nizami. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute,
25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 95.00 Only

www.bjilibrary.com

সূচীপত্র

ইসলামী আদাবে জিন্দেগী ০৫
আদাবে কুরআন ১২
সিরাতে রসূল ও সুন্নাতে রাসূলের প্রতি আদব ২০
পারিবারিক জিন্দেগীর আদাব ২৩
সালাম ও মুসাফাহার আদাব ২৭
সালামের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় রীতি ২৯
সামাজিকতায় ইসলামী আদব ৩০
মজলিসের আদব ৩৫
মেহমানদারীর আদব ৩৮
খানাপিনার আদব ৪১
পোশাক পরিচ্ছদের আদব ৪৬
অসুস্থ ব্যক্তির সেবা শুশ্রূষার আদব ৪৯
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব ৫৫
জানাযায় অংশগ্রহণ, সমবেদনা জ্ঞাপন ও কবর যিয়ারত ৫৭
কবর যিয়ারত প্রসঙ্গে ৬০
মসজিদের আদব ৬২
সফরের আদব ৬৬
সাধারণ আদব ৭৩
ইসলামী আদাবে জিন্দেগীর ক্ষেত্রে দু'টি হাদীসের সতর্কবাণী ৭৫

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইসলামী আদাবে জিন্দেগী

মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির সেরা, আশরাফুল মাখলুকাত নামেই পরিচিত। সৃষ্টিগতভাবে মানুষের মধ্যে জৈবিক বা পাশবিক সত্তার পাশাপাশি নৈতিক সত্তার সংযোজনই তাকে এই সম্মান ও মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে। মানুষের মধ্য থেকে যে বা যারা নৈতিক সত্তাকে উন্নত ও শক্তিশালী করে পশু সত্তার উপর প্রাধান্য বিস্তারে বা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অধীনে রাখতে সক্ষম হয়, মানুষ হিসেবে তাদের জীবনই হয় ধন্য এবং সফলকাম। জন্মগতভাবে মানব জাতিকে আল্লাহ তায়ালা বিবেকের যে নিয়ামত দান করেছেন, সেই বিবেক ভালোকে ভালো—মন্দকে মন্দ, সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা হিসেবে চিহ্নিত করতে সক্ষম, সক্ষম ন্যায় অন্যায়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করতে। আল্লাহ প্রদত্ত এই বিবেককে যারা কাজে লাগায় উত্তরোত্তর এই বিবেককে শানিত করে তারাই মানুষ হিসেবে সফল জীবনের অধিকারী হয়। আর যে বা যারা এই বিবেকের শক্তিকে অবদমিত করে, বিবেকের রায়ের বিরুদ্ধে কাজ করতে করতে বিবেকের অপমৃত্যু ঘটানোর অপেক্ষা করে থাকে, তারা মানুষ হিসেবে সফল তো নয়ই, বরং পশুর চেয়েও অধম হয়ে যায়।

আল্লাহ তাঁর কিতাবে হাকিমে মানুষের দু'টি পরিচয় যুগপৎভাবেই তুলে ধরছেন। সূরায়ে ত্বীনে আল্লাহ বলেছেন ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ـ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ـ

"আমি মানব জাতিকে সুন্দরতম সৃষ্টি হিসেবে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তাকে নিক্ষেপ করেছি ধ্বংসের অতল তলে।"

আরো বলেছেন ঃ . وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْٓ اٰدَمَ

"আমি বনী আদমকে (আদম সন্তানকে) সম্মান ও মর্যাদার আসন দান করেছি।"

www.bjilibrary.com

আবার এই মানুষ সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা ঃ

لَهُمْ قُلُوْبٌ لاَّ يَفْقَهُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ اٰذَانٌ لاَّ يَسْمَعُوْنَ بِهَا ط اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ط

"তাদের বিবেক আছে, কিন্তু সেই বিবেক দিয়ে তারা কিছু বুঝতে চায় না, তাদের চোখ আছে, কিন্তু চোখ দিয়ে কিছু দেখেও দেখে না। তাদের কান আছে, কিন্তু সে কানে তারা কিছু শুনেও শোনে না। তারা তো পশুর সমান, বরং তার চেয়ে অধম।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১৭৯

আল্লাহর কিতাবে মানুষের এই দু'টি বিপরীতমুখী ছবি, বিপরীতমুখী চরিত্র মানব সমাজের একান্তই বাস্তব চিত্র। একটু গভীর অন্তরদৃষ্টি দিয়ে মানব সমাজে গভীরভাবে অনুসন্ধান চালালে এর বাস্তবতা বুঝার পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব। মানুষের অন্তরে লালিত পশুত্ব ও পাশবিকতার শক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলে তা পশু—জঘন্য হিংস্র পশুর পাশবিকতাকেও হার মানায়। মানুষের সমাজকে এই পশুত্ব ও পাশবিকতার কবল থেকে মুক্ত করে মানবতা মনুষত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তাদের মধ্যে বিবেকের শক্তিকে, নৈতিক সত্তাকে জাগ্রত, উন্নত ও শক্তিশালী রূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই নবী-রসূলদের মাধ্যমে আসমানী হেদায়াত বা জীবন নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন। সেই সাথে ঘোষণা করেছেন ঃ

فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

"এ নির্দেশ বা হেদায়াতের যারা স্বার্থক অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয়ের বা দুশ্চিন্তার কারণ থাকবে না"–সূরা আল বাকারা ঃ ৩৮।

অর্থাৎ তারা পশুত্ব ও পাশবিকতার কাছে পরাভূত হওয়ার বিপদ থেকে মুক্তি থাকবে। বরং পশুত্ব ও পাশবিকতার উপরে মানবতা ও মনুষত্বের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে। অন্য কথায় মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা পেতে হলে আল্লাহ প্রদত্ত নবী-রসূল প্রতিষ্ঠিত হেদায়াতের (জীবন নির্দেশিকার) অনুসরণের কোনো বিকল্প নেই।

মানুষের সমাজকে তাই সকল প্রকারের পাশবিকতা ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি থেকে মুক্ত ও নিরাপদ করার জন্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-

www.bjilibrary.com

রসূল আ. পাঠানো হয়েছে এবং তাদের সাথে দেয়া হয়েছে কিতাব বা ছহিফা। নবী-রসূল এবং কিতাব ও ছহিফা প্রেরণের লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ "যাতে করে মানবজাতি ন্যায় ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। মানুষের সমাজ থেকে সকল প্রকারের অন্যায়, অনাচার, দুরাচার, পাপাচার দূর করে, শান্তি সুখের ন্যায় ইনসাফের একটি মার্জিত পরিশিলিত সমাজ গড়ার জন্যেই ইসলামের নিয়মনীতি বা জীবনাচরণকে অপরিহার্য করা হয়েছে মানবজাতির জন্যে।"

মানুষের মধ্য থেকে যারা আল্লাহর রসূল, কিতাব ও আখেরাতসহ মৌলিক কিছু বিষয়ের প্রতি ঈমানের ঘোষণা দিয়ে মুসলিম নামে পরিচিত হয়, তারা শুধু তাদের জন্যে নয়, গোটা মানব জাতির প্রতি একটি পবিত্র দায়িত্ব পালনে আদিষ্ট। এজন্য তাদের কুরআনের দু'টি আয়াতের মাধ্যমে এক ও অভিন্ন দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আয়াত দু'টি সামনে রাখলে কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই আমরা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারব, আমাদের উপর ন্যস্ত সেই দায়িত্বটা আমরা কে কোথায় কতটুকু পালন করে যাচ্ছি।

একটি আয়াত হলো ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ

"তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি। তোমাদেরকে গড়া হয়েছে গোটা মানবজাতির কল্যাণের জন্যে। তোমরা মানবজাতিকে সৎপথে পরিচালিত করবে, অসৎ পথে বাধা দেবে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০

দ্বিতীয় আয়াত হলো ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ط

"এভাবে তোমাদের একটি মধ্যমপন্থী জাতি হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে যাতে করে তোমরা গোটা মানব জাতির জন্য সত্য ও ন্যায়ের সাক্ষী বা প্রতীক হতে পার (অনুসরণীয় অনুকরণীয় আদর্শ হতে পার) আর তোমাদের জন্য সত্য ও ন্যায়ের সাক্ষী বা প্রতীক অবর্ণনীয় আল্লাহর রসূল।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৩

www.bjilibrary.com

এ দু' আয়াতে মুসলিম উম্মাহর যে পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে এবং পরিচয়ের প্রতি সুবিচার করার লক্ষ্যে যে দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করা হয়েছে, তার পরিপূরক বা সম্পূরক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে আরো দু'টি আয়াতের মাধ্যমে যার একটি হলো সূরা আল মায়েদার ৮ আয়াতে ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ز وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ط اِعْدِلُوْا قف هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ز وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ـ

"হে ঈমানদারগণ! সত্যের ওপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো এবং ইনসাফের সাক্ষদাতা হয়ে যাও। কোনো দলের শত্রুতা তোমাদেরকে যেনো এতোটা উত্তেজিত না করে তোলে যার ফলে তোমরা ইনসাফ থেকে বিচ্যুত হও। তোমরা ইনসাফ করো। এটি আল্লাহভীতির সাথে সর্বাধিক সামঞ্জস্যশীল। আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত আছেন।"

আর অপরটি হলো সূরা আন নিসার ১৩৫ আয়াতে ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ج اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا قف فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ج وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ـ

"হে ঈমানদারগণ! ইনসাফের পতাকাবাহী ও আল্লাহর সাক্ষী হয়ে যাও। তোমাদের ইনসাফ ও সাক্ষ্য তোমাদের নিজেদের ব্যক্তিসত্তার অথবা তোমাদের বাপ-মা ও আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধে গেলেও। উভয় পক্ষ ধনী বা অভাবী যাই হোক না কেন আল্লাহ তাদের চেয়ে অনেক বেশী কল্যাণকামী। কাজেই নিজেদের কামনার বশবর্তী হয়ে ইনসাফ থেকে বিরত থেকো না। আর যদি তোমরা পেঁচালো কথা বলো অথবা সত্যতাকে পাশ কাটিয়ে চলো, তাহলে জেনে রাখো, তোমরা যা কিছু করছো আল্লাহ তার খবর রাখেন।"

www.bjilibrary.com

উপরোল্লিখিত দুটি আয়াতের মূল আবেদন, মূল বক্তব্য এক ও অভিন্ন, আর তা হলো, জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে ন্যায় ইনসাফ তথা শান্তি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। তাদেরকে গোটা মানব সমাজকে মার্জিত পরিশিলিত সমাজে পরিণত করার জন্য পতাকাবাহীর ভূমিকা পালন করতে হবে। আমরা একটু আগেই বলেছি দুনিয়াতে আল্লাহর পক্ষ থেকে যত নবী-রসূল সা. এসেছে, যত আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে সব কিছুরই অভিন্ন লক্ষ্য ছিলো মানুষের সমাজকে শান্তি-সুখের ও ন্যায়-ইনসাফের সমাজে পরিণত করা। এ লক্ষ্যে সকল নবী-রসূল এবং আসমানী গ্রন্থসমূহের অভিন্ন শিক্ষার মূল সুর—মানুষের ব্যক্তি ও পরিবারকে সুন্দর ও মার্জিত নৈতিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গোটা সমাজকে মার্জিত পরিশিলীত সমাজে পরিণত করা।

আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত হেদায়াত বা জীবন নির্দেশিকার সর্বশেষ মাধ্যম সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সা. এবং সর্বশেষ কিতাব আল কুরআন। আল্লাহর রসূল সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণা ঃ

إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ـ

"হে নবী! তুমি সর্বোত্তম চরিত্রের উপর, সর্বোত্তম নীতি নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত।"

আল্লাহ পাকের আরো ঘোষণা ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ـ

"তোমাদের জন্য রসূলের মধ্যেই রয়েছে অনুসরণীয় সর্বোত্তম আদর্শ।"

শেষ নবী নিজে তার আগমন সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন, "আমাকে মানবতার শিক্ষক হিসেবে পাঠানো হয়েছে।" সেই সাথে পরিপূরক ঘোষণা "আমাকে পাঠানো হয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ ও নীতি নৈতিকতা ও চরিত্রের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যে।" অতএব ইসলাম নিছক সংকীর্ণ অর্থে ধর্মীয়গ্রন্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ থেকে পশুত্ব ও পাশবিকতার প্রাধান্য খতম করে মানবতা ও মনুষত্বের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা-ইসলামের মূল কথা, মূল লক্ষ্য। এই মূল লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে গোটা কুরআন এবং রসূলের জীবনকে মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে আমাদের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন,

www.bjilibrary.com

সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে পরিচালনার সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে তাহলেই মানুষের সমাজ ইসলামী আদর্শের মত আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামতের সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হবে। সক্ষম হবে একটি পাপ পংকিলতা ও সংঘাত সংঘর্ষমুক্ত একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজের সদস্য হিসেবে বসবাস করতে, জীবনযাপন করতে। একটি মার্জিত পরিশিলীত মানব সমাজ গড়ে তোলার জন্যে ইসলামের নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে মানুষের ব্যক্তি, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন পরিচালনার জন্য সামষ্টিক উদ্যোগের যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি ব্যক্তি ও পরিবারের ভূমিকাও এক্ষেত্রে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যক্তির সমষ্টিই তো সমাজ, আর সমাজের প্রাথমিক ইউনিট হলো পরিবার। গোটা দেশ ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের জন্য যেমন রাষ্ট্র প্রধান বা সরকার প্রধানকে জবাবদিহি করতে হবে। সামাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরকে তাদের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। তেমন পরিবারের প্রধানকে তার গোটা পরিবারের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। এমনকি স্ত্রীকেও তার স্বামীর সংসার ও সন্তানদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। জবাবদিহি করতে হবে বাড়ীর একজন চাকরকেও তার মালিকের পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে।

এ জবাবদিহি করতে হবে চূড়ান্ত পর্যায়ে আদালতে আখেরাতে বিচারের মুহূর্তে পরম পরাক্রমশালী মালেকি ইয়াওমুদ্দিন আল্লাহ তাআলার কাছে। যিনি রহমানুর রহীম, গাফুররুর রহীম হওয়ার সাথে সাথে জব্বার এবং কাহ্হারও বটে। এভাবে মহান আল্লাহর দরবারে সকল কর্মকাণ্ডের জন্য জবাবদিহি করতে হবে এই অনুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে যে সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে উঠবে, সেখানেই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিন্তকরণের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা বাস্তবে সম্ভব হতে পারে। আর ইসলামের নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধই এর একমাত্র নিয়ামক শক্তি।

ইসলামী আদর্শের পূর্ণাংগ দিক ও বিভাগের ব্যাপারে মৌলিক বা বুনিয়াদী জ্ঞানার্জন ছাড়া আল্লাহ প্রদত্ত ও নবী-রসূল প্রদর্শিত এ সত্য ও ন্যায়ের সহজ-সরল ও সঠিক পথে স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে চলার যোগ্যতা কোনো মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে না। ইসলামে জ্ঞানার্জনকে তাই প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরয করা হয়েছে। আর এই জ্ঞানের প্রধান উৎস

www.bjilibrary.com

আল্লাহর কুরআন এবং দ্বিতীয় উৎস সুন্নাতে রসূল ও সীরাতে রসূল। কুরআনের শিক্ষাকে বাস্তবে উপিলব্ধি করে তার স্বার্থক অনুসরণের জন্য যেমন সুন্নাতে রসূল ও সীরাতে রসূলের অনুসরণ অপরিহার্য তেমনি সুন্নাতে রসূল ও সীরাতে রাসূলের স্বার্থক উপলব্ধি অনুসরণের জন্য কুরআনকে সামনে রাখাও অপরিহার্য।

"ইসলামী আদাবে জিন্দেগী" অনুসরণ করে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে হলে তাই প্রথমে আল্লাহর কুরআন এবং রসূলের সুন্নাত ও সীরাতের প্রতি যেরূপ আচরণ বা আদব রক্ষা দাবী করে, সে দাবী পূরণে এগিয়ে আসতে হবে।

❐

www.bjilibrary.com

আদাবে কুরআন

আল্লাহর কুরআনের প্রতি আদব রক্ষা করে জীবন গড়ার সিদ্ধান্ত নেয়াই এ পথের পথিকের প্রথম ও প্রধান করণীয়। কুরআন সেই আল্লাহর কিতাব যিনি আসমান জমিনের একক শ্রেষ্ঠ মালিক মোখতার, লালন পালনকারী, যিনি এ ব্যাপারে কারো মুখাপেক্ষি নন। যার ক্ষমতা প্রতিপত্তিকে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। তিনি তার সত্য নবী সর্বশেষ নবীর মাধ্যমে যে কিতাব দিয়েছেন, গোটা মানব জাতির হেদায়াতের জন্য সেই কিতাব মানব রচিত কোনো কিতাবের মতো নয়। এ কিতাব মুহাম্মদ সা.-এর নিজের রচিত নয়। সবটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে আগত। তাই এতে ভুল-ভ্রান্তির কোনো অবকাশই নেই। এ কিতাবই মানুষের সমাজকে সুখী সুন্দর ও শান্তির সমাজে পরিণত করার জন্য বাস্তবসম্মত পূর্ণ জীবনব্যবস্থা এবং জীবন চলার সঠিক ও নির্ভুল পথ নির্দেশনা দিয়ে স্বয়ং আল্লাহ পাঠিয়েছেন তার সৃষ্টির সেরা মানব জাতির জন্য তার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ সা. এর মাধ্যমে। আল কুরআন সম্পর্কে এই পূত-পবিত্র মন- মানসিকতা নিয়েই এর অনুশীলনীতে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

আল্লাহর কিতাব হিসেবে কুরআন যতটা গুরুত্ব ও আস্থার সাথে অধ্যয়ন ও বার বার অনুশীলন করা অপরিহার্য তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের তেমন কোনো দরকার আছে বলে মনে করি না। আল্লাহর জাত সিফাতের প্রতি তার হক ও এখতিয়ারের প্রতি যথাযথ ঈমানই মানুষের মনে এমন অনুভূতি ও উপলব্ধি সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট।

আল্লাহর কিতাবের মূল বক্তব্য বিষয় 'মানুষ'। মানুষের কিসে কল্যাণ হবে, আর কিসে হবে অকল্যাণ। মূলতঃ এটাই কুরআনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। যার উপরে এই কুরআন নাযিল করা হয়েছে, তার প্রতি আমাদের কর্তব্য করণীয় কি হওয়া উচিত তা আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তার নিজের ভাষায় বলেছেন ঃ

مَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ـ

"তোমাদের কাছে রসূল যা নিয়ে এসেছেন তাই গ্রহণ কর, আর যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক।"

www.bjilibrary.com

আল্লাহর এই সর্বশেষ কিতাব কুরআন এর অপর নাম ফুরকান, যার অর্থ হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শনকারী। যার অনিবার্য দাবী হল কুরআন যাকে সত্য বলে আখ্যায়িত করেছে বা নির্দেশিত করেছে তাকে আঁকড়ে ধরা, যাকে মিথ্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে, অন্যায় ও ক্ষতিকর বলে উল্লেখ করেছে, তাকে বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে, বাস্তবে বর্জন করতেও হবে। কুরআনের পাঠকদের উচিত কুরআনের উপর পড়াশুনার মুহূর্তে রসূলের শিখানো দোয়াটা দিয়ে শুরু করা। যে দোআটি হলো ঃ

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اِتِّبَاعَهُ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَارْزُقْنَا اِجْتِنَابَهُ.

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে হককে হক হিসেবে, সত্যকে সত্য হিসেবে, ন্যায়কে ন্যায় হিসেবে জানার বুঝার তৌফিক দাও।" আরও তৌফিক দাও সত্য, ন্যায় ও হককে অনুসরণ করার। আর বাতিলকে মিথ্যা ও অন্যায়কে মিথ্যা বাতিল ও অন্যায় হিসেবে জানার বুঝার তৌফিক দাও। আরো তৌফিক দাও জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে বাতিল, মিথ্যা ও অন্যায়কে বর্জন করে চলার। কুরআনের পাঠককে এমন একটি সুদৃঢ় মনের সংকল্প নিয়েই কুরআন পাঠে মনোযোগী হতে হবে এবং পাঠের সাথে সাথেই কোন্‌টা গ্রহণীয় আর কোন্‌টা বর্জনীয় তা চিহ্নিত করে নিজেকে আত্মসমালোচনায় ও মান বিশ্লেষণে মনোনিবেশ করে যা গ্রহণীয় তা গ্রহণের জন্য আল্লাহর কাছে তৌফিক চেয়ে নিজের মনে সুদৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে হবে আর যা বর্জনীয় তাও চিহ্নিত করে, তা বর্জনের জন্য আল্লাহর কাছে তৌফিক কামনা করে তাৎক্ষণিকভাবে বর্জনীয় বিষয়গুলো জীবন থেকে ঝেড়ে ফেলার সুদৃঢ় সংকল্প নিতে হবে। মূলতঃ কুরআনের প্রতি বাহ্যিক ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের চেয়ে কুরআনের প্রতি প্রকৃত আদব রক্ষার এটাই হক, সঠিক ও বাস্তব পন্থা।

কুরআন সকল মানুষের জন্য সঠিক ও নির্ভুল পথের সন্ধান দেয়ার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। সকল মানুষকেই আল্লাহ তা'আলা এর কল্যাণ ও অকল্যাণ সম্পর্কে অবহিত ও সতর্ক করেছেন। কিন্তু সবাই এই কুরআন থেকে শিক্ষা নিয়ে কল্যাণের পথে চলতে এবং অকল্যাণের পথ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলতে পারে না। কুরআনকে 'হুদাল্লিন্নাস'ও বলা হয়েছে, আবার 'হুদাল্লিল মুত্তাকীন'ও বলা হয়েছে। এ

www.bjilibrary.com

দু'য়ের মধ্যে যে তাৎপর্যপূর্ণ সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে তা অনুধাবন করেই কুরআন থেকে সঠিক ও নির্ভুল পথের সন্ধান লাভ করা এবং সে অনুযায়ী জীবনযাপন করা সহজ ও সম্ভব হতে পারে।

হেদায়াত শব্দের দুটি তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ আছে। আরবীতে এর একটিকে বলা হয় "এরাতুত ত্বরিক" বা পথ দেখিয়ে দেয়া আর দ্বিতীয়টি হলো "ইছাল এলাল মাত্লুব বা গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেয়া। হুদাল্লিন্নাস বলতে প্রথম অর্থই বুঝিয়ে থাকে। আর হুদাল্লিল মুত্তাকীন বলতে দ্বিতীয় অর্থটি বুঝতে হবে।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা হুদাল্লিল মুত্তাকীন হিসেবে কুরআনকে উপস্থাপনের সাথে মুত্তাকি কারা, কি তাদের বৈশিষ্ট্য তারও উল্লেখ করেছেন সাথে সাথেই। যারা গায়েবের প্রতি ঈমান আনে, নামাজ কায়েম করে, আল্লাহর দেয়া রিয্ক থেকে খরচ করে (আল্লাহর পথে), সর্বশেষ নবীর উপর নাযিলকৃত কিতাবের উপর ঈমান আনে, সেই সাথে ঈমান আনে পূর্ববর্তী নবীদের উপর নাযিলকৃত কিতাবের প্রতি ও সর্বোপরি কথা তারা পরকালের প্রতি (আখেরাত) পোষণ করে প্রগাঢ় অবস্থা ও সুদৃঢ় বিশ্বাস।

অন্যত্র মুত্তাকির সঠিক পরিচয় ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ج وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ لا وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ج

"কেবলমাত্র পূর্ব ও পশ্চিমে মুখ ফিরানোর মধ্যে নেক কাজ সীমাবদ্ধ নয়, বরং নেক্কার তারাই যারা ঈমান আনে আল্লাহর প্রতি, আখেরাতের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি এবং নবী-রসূলদের প্রতি ও আসমানী কিতাবের প্রতি, সেই সাথে তারা আল্লাহর মহব্বতের তাগিদে ইয়াতীম-মিসকীন ও অভাবগ্রস্থ লোকদের জন্য আর্থিক সাহায্য

www.bjilibrary.com

প্রদান করে, আর্থিক সাহায্য প্রদান করে ক্রীতদাসদের মুক্তির জন্য (বর্তমান প্রেক্ষাপটে গরীব কারাবন্দীদের মুক্ত করার ক্ষেত্রেও শেষের কথাটি প্রযোজ্য হতে পারে)।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৭

কুরআনের পণ্ডিত হওয়া বা কুরআনের জ্ঞানের ভাণ্ডার বিতরণ করার ফলে কুরআনের উপরে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করা সত্ত্বেও একজন কুরআনের মূল হেদায়াত অনুধাবনে সক্ষম নাও হতে পারে। কুরআন অত্যন্ত বাস্তবতার আলোকেই এ থেকে হেদায়াত লাভের জন্য কুরআনের পাঠকদের মধ্যে তাকওয়ার গুণাবলী অর্জনকে অপরিহার্য করেছে। কুরআনের এ ঘোষণাটি প্রনিধানযোগ্য ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا

"আমি কুরআনে যা কিছু নাযিল করেছি তা তো মু'মিনদের জন্য (শারীরিক, মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক) সকল প্রকার রোগ বালাই থেকে আরোগ্য লাভের উপায় ও রহমত স্বরূপ। কিন্তু যারা জালিম তারা এ থেকে ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই লাভ করতে পারে না।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮২

জালেম শব্দের এখানে প্রায়োগিক অর্থ হবে, যারা কুরআনের এই নিয়ামতকে যেভাবে ব্যবহার করা উচিত সেভাবে ব্যবহার করে না। আরবীতে জুলুম শব্দের আভিধানিক অর্থ, কোনো বস্তুকে যে জায়গায় রাখা উচিত সেটাকে সে জায়গায় না রাখা। অর্থাৎ যার যে মর্যাদা বা সম্মান পাওয়া উচিত তাকে সেই সম্মান বা মর্যাদা না দেয়া, আল্লাহ তা'আলা তার সাথে শিরক করাকে অত্যন্ত বড় রকমের জুলুম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কারণ আল্লাহর জাত ও সিফাতের প্রতি সম্যক ঈমানের অনিবার্য দাবী তার 'হক' ও এখতিয়ারের সাথে সৃষ্টি জগতের কোনো কিছুরই তুলনা হতে পারে না—সমকক্ষ হবার তো প্রশ্নই উঠে না। আল্লাহর পরিচয় সত্ত্বেও যদি এর সৃষ্ট কাউকে তার শরীক বানানো হয় তার অর্থ হয়, আল্লাহকে সঠিক মর্যাদা দানে ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের এই আচরণের প্রতি ইংগিত করেই আল্লাহর ঘোষণা "তারা আল্লাহকে সঠিক ও যথাযথ মর্যাদা দিতে পারেনি।"

www.bjilibrary.com

কুরআন পাঠের সূচনায় আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ ঃ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ। "বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়ে নাও।" মূলতঃ কুরআনী হিদায়াত লাভের পথে শয়তানী শক্তি যাতে বাধ সাধতে না পারে সেই জন্য আল্লাহর এই নির্দেশনা মূলত একটি সতর্ক সংকেত।

আল্লাহর রসূল সা. কুরআনকে মেঘমালার সাথে তুলনা করেছেন আর মানুষকে তুলনা করেছে মাটির বিভিন্ন ধরন প্রকৃতির সাথে। মেঘমালা থেকে বৃষ্টি জমিনের সর্বত্র সমানভাবে বর্ষিত হলেও সব মাটির ধারণ ক্ষমতা বা সব মাটির ধরন ও প্রকৃতি এক রকম না হওয়ার কারণে সর্বত্র বৃষ্টির সুফল একইভাবে পাওয়া যায় না। মানুষের জন্য কুরআনী হেদায়াত লাভের ব্যাপারে অনুরূপ দৃষ্টান্ত প্রযোজ্য বিধায় আল্লাহর রসূল সা. এই উদাহরণটি দিয়েছেন।

কুরআনের আয়াতসমূহকে প্রথমত আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। কুরআনের পরিভাষায় এর একাংশ 'মুতাশাবিহাত' যা প্রাকৃতিক বা জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনুধাবন বা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, তাই এর প্রতি ঈমান বিল গায়েবের আওতায় দ্বিধাহীন চিত্তে ঈমান আনতে হবে। দ্বিতীয়টি "মুহকাম"এটাকেই বলা হয়েছে "হুন্না উম্মুল কিতাব" মুহকাম পর্যায়ের আয়াতগুলোই কুরআনের মূল শিক্ষা ও বিষয়বস্তু। এই মুহকামের আওতায় আসে আরো তিন প্রকার আয়াতসমূহ। যার একাংশে হালালের বর্ণনা এসেছে, কি কি জিনিসকে আল্লাহর তার বান্দার জন্য হালাল করেছেন। কুরআনের অনিবার্য দাবী হলো আল্লাহ ঘোষিত হালালসমূহকে গ্রহণ করা, আর একাংশে আসছে হারাম জিনিস বিষয়সমূহের বর্ণনা। কুরআনের পাঠকের দায়িত্ব হল কুরআনে আল্লাহ যেসব বিষয়সমূহকে হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন সেগুলোকে বর্জন করা। মুহকামের পর্যায়ের তৃতীয় আয়াতসমূহকে আল্লাহর রসূল "আমছাল" বা দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন এ থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

আল্লাহর কিতাব দৃষ্টে উদাহরণ বা রাসূলের ভাষায় আমছাল দুই ধরনের, একটি হলো ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বর্ণনা। অতীতে আল্লাহর নাফরমানীর কারণে নবী-রসূলদের দাওয়াত ও হেদায়াত প্রত্যাখ্যানের কারণে কাদের কি করুণ পরিণতি হয়েছে। নমরূদ, ফেরাউনের কি

www.bjilibrary.com

পরিণতি হয়েছে, আদ, সামূদ প্রভৃতি জাতি কিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, কুরআনে উল্লেখিত এই ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তগুলো অধ্যয়নের অনিবার্য দাবী হল, ঐসব পরিণাম-পরিণতির সম্মুখীন যেন আমাদের হতে না হয়, সেজন্য আল্লাহর নাফরমানী থেকে বাচার সিদ্ধান্ত নেয়া রাসূলের দাওয়াত ও হেদায়াতের সঠিক অনুসরণের জন্য দৃঢ় সংকল্প ও বাস্তব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

দ্বিতীয় পর্যায়ের দৃষ্টান্ত আল্লাহ পেশ করেছেন গোটা সৃষ্টি জগতকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনার আহ্বান জানিয়ে এবং মানুষের নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে। কুরআনের নিজস্ব পরিভাষায় গোটা সৃষ্টি জগতকে 'আফাক' বলা হয়েছে। মানুষের নিজস্ব বিষয়টিকে বলা হয়েছে 'আনফুস'।

এই 'আফাক' এবং 'আনফুস' নিয়ে মানুষ যদি অনুসন্ধানী মন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে তাদের মন থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই স্বীকৃতি আসতে বাধ্য, আল্লাহর তৌফিক প্রসঙ্গে এবং সেই সাথে আখেরাতের জিন্দেগী সম্পর্কে। আল্লাহ তা'য়ালার ঘোষণা ঃ

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِى الْأَلْبَابِ ـ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ج رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً ج سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

"নিশ্চয়ই আসমান জমিনের সৃষ্টির মধ্যে, দিবা-রাত্রির পরিবর্তন পরিবর্ধনের মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন (তৌহিদ ও আখেরাতের) রয়েছে। যারা দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় এবং শায়িত অবস্থায়ও আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও জমিনের মূল রহস্য নিয়ে (এই চিন্তা গবেষণার ফলে তাদের মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি এসে যায় এই ভাষায়) হে আমাদের পরোয়ারদেগার ! তুমি এর কোনো কিছুই অর্থহীনভাবে সৃষ্টি করোনি। বাজে ও অনর্থক কাজ করা থেকে তুমি পাক-পবিত্র ও মুক্ত। অতএব (তোমার ঘোষণা আখেরাতের শেষ বিচার ও হক) আমাদেরকে মুক্তি দাও দোযখের আগুন থেকে।"—সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০-১৯১

www.bjilibrary.com

গোটা সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করা সকলের জন্য হয়তো সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু যেকোনো সাধারণ মানুষই নিজের সম্পর্কে নিজের এই দুনিয়ায় আগমন সম্পর্কে অবশ্যই কিছু না কিছু চিন্তা-ভাবনা করতে সক্ষম। তাই আল্লাহর ঘোষণা ঃ

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ـ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ـ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ـ

"মানুষের ভেবে দেখা উচিৎ তাকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে ? তাকে তো সৃষ্টি করা হয়েছে উদগিরিত পানি থেকে যা নির্গত হয় বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশ থেকে।"–সূরা আত তারিক ঃ ৫-৭

কুরআন আল্লাহর কিতাব। এই কিতাবের ভাব ভাষা সবটাই আল্লাহর, এই কিতাব যে বা যারা অধ্যয়ন করবে তাদের অন্তরে এই আস্থা ও বিশ্বাস লালন করেই অধ্যয়ন করতে হবে। অন্য কারো কণ্ঠে যদি কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ কারো কানে আসে, অথবা কারো সামনে যদি আল্লাহর এই কিতাবের তেলাওয়াত করা হয়, তাহলে এই কিতাবের প্রতি যথাযথ আদব রক্ষার জন্যই পূর্ণ নিরবতা অবলম্বন করতে হবে। আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির আশায় পূর্ণ মনোযোগ সহকারে, গভীর মনোনিবেশ সহকারে শোনার চেষ্টা করতে হবে। সূরায়ে আনফালে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা প্রকৃত ঈমানদার মানুষের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا ـ

"মুমিন তো কেবল তারাই, যাদের সামনে আল্লাহর কথা আলোচিত হলে তাদের হৃদয়ে কাঁপন শুরু হয়, আর যখন তাদের নিকট আল্লাহর কোনো আয়াত তেলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।"–সূরা আল আনফাল ঃ ২

অর্থাৎ আল্লাহর জাত, ছিফাত, হক ও এখতিয়ারের প্রসঙ্গে কোনো আলোচনা শুনলে তাদের মনে ভয়ভীতির সৃষ্টি হয়, আর কুরআনের কোনো অংশের তেলাওয়াত শুনলেই তাদের ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পায়। এখানে আল্লাহর প্রসঙ্গে আলোচনা হওয়া আর আল্লাহর কিতাবের কোনো

www.bjilibrary.com

অংশের তেলাওয়াত মূলত এক ও অভিন্ন বিষয়। কুরআনের প্রতি যথাযথ আদব রক্ষা করে কুরআন নিজে তেলাওয়াত করলে অথবা অপরের কণ্ঠে তেলাওয়াত শুনলে প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তির মনে আল্লাহর ভয় যেমন সৃষ্টি হয় তেমনি সেই আল্লাহভীতিই ঈমানী শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। তাই ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গোটা জীবন পরিচালনার জন্য যে জ্ঞান অপরিহার্য তার যেমন প্রথম ও প্রধান উৎস ঈমানের সাথে, ঈমানের দাবী পূরণের সংকল্প নিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করা অপরিহার্য, তেমনি কুরআনের আলোকে নিজের জীবন জিন্দেগীতে বাস্তবে পরিবর্তন আনার সংকল্প সহ কুরআন অধ্যয়নের কোনো বিকল্প নেই।

❐

www.bjilibrary.com

সিরাতে রসূল ও সুন্নাতে রাসূলের প্রতি আদব

ইসলামী জীবন যাপনের মূল হেদায়াত আল্লাহর কিতাব আল কুরআনের মাধ্যমেই আমরা পেয়েছি, তবে কুরআনের হেদায়াতের উপর আমলের বাস্তব ও জীবন্ত নমুনা হলো আল্লাহর প্রিয় নবী, সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা.। কুরআনের প্রতি যথাযথ আদব রক্ষার অনিবার্য দাবীই হল সীরাতে রসূল এবং সুন্নাতে রসূলের যথাসাধ্য অনুসরণের চেষ্টা করা। রসূল সা.-এর সিরাত ও সুন্নাত তথা তার জীবনের সুমহান ও সুউচ্চ আদর্শের সার্থক অনুসরণের জন্য ও কুরআন থেকে সীরাতে রসূল ও সুন্নাতে রসূল সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের চেষ্টা করা। আবার কুরআনের মূল বক্তব্য, মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের সম্যক অনুধাবনের ও উপলব্ধির জন্য বিশেষ করে কুরআনী হেদায়াত ও আহকামের উপরে যথাযথ আমলের জন্য রাসূলের সীরাত ও সুন্নাতকেই প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

সীরাতে রসূলের উপর অসংখ্য বই পুস্তক লিখিত হয়েছে। বিভিন্ন ভাষায় শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা.-কে নিয়ে যত বই পুস্তক হয়েছে, দুনিয়ার ইতিহাসে এর কোনো নজীর নেই। কিন্তু যদি কখনও খোদা নাখাস্তা কোনো দুর্ঘটনায় বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে এসব জীবনী গ্রন্থ নষ্ট হয়ে যায় আর শুধু বাকী থেকে যায় কুরআন তাহলে রাসূলের সুমহান সীরাত বা জীবন চরিত জানার জন্য আল্লাহ কর্তৃক সরাসরি সংরক্ষিত কিতাব আল কুরআনই হতে পারে যথেষ্ট অবলম্বন।

আল্লাহ তায়ালা যেমন তার নিজস্ব ঘোষণা অনুযায়ী তার সর্বশেষ কিতাব কুরআনকে সংরক্ষণ করেছেন। সকল প্রকারের বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করেছেন, তেমনি তার সর্বশেষ নবীর জীবনীকেও নিখুতভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। কোনো অতিরঞ্জন বা কিংবদন্তির ছাপ পড়তে দেননি, তার সর্বশেষ কিতাবের বাহক সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সা.-এর সীরাত ও সুন্নাতের ক্ষেত্রে। আল্লাহর রসূলের জিন্দেগীর খুটিনাটি বিষয়গুলো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে যাচাই বাছাই করে সংকলিত করেছেন আল্লাহর লক্ষাধিক বান্দা। আল্লাহর রসূলের সীরাত ও সুন্নাতের সংরক্ষণের

www.bjilibrary.com

জন্য সর্বযুগেই আল্লাহর অসংখ্য বান্দা অত্যন্ত যত্ন সহকারে গবেষণাধর্মী কাজে নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বিশেষ করে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম আজমাইন এর ভূমিকা মানব ইতিহাসে অতুলনীয়। তাদের একাংশ কুরআনকে বুকে ধারণ করে, একে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি তৌফিক পেয়ে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন, তেমনি প্রায় লক্ষাধিক সাহাবায়ে কেরামের জীবন সংরক্ষণ করতে হয়েছে আল্লাহর প্রিয় নবীর জীবন জিন্দেগীর খুঁটিনাটি বিষয়াবলী—তার কথা, কাজ এবং অন্যের সম্পাদিত কোনো ভাল কাজের প্রতি অনুমোদন অথবা কোনো খারাপ কাজের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশের ঘটনা এমন সুন্দরভাবে এবং বিজ্ঞানসম্মত মানদণ্ডে যাচাই-বাছাই করা হয়েছে, এটা সত্যি ইতিহাসের একটি বিস্ময়কর ঘটনা ।

আল্লাহর রসূল দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার আগে বিদায় হজ্জের ভাষণে যথার্থভাবেই বলে গেছেন, বরং কিয়ামত পর্যন্ত গোটা মুসলিম উম্মাহর জন্য নির্দেশনা দিয়ে গেছেন ঃ

تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ .

"আমি তোমাদের জন্য দুটি বিষয় রেখে যাচ্ছি যতক্ষণ তোমরা এই দু'টি বিষয় (জিনিস) আকড়ে ধরে থাকবে ততোদিন তোমাদের পথভ্রষ্ট হবার কোনো ভয় থাকবে না বা তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো আল্লাহর কুরআন, আর দ্বিতীয়টি হলো আমার সুন্নাহ।"

ইসলামী জিন্দেগী যাপনের জন্য তাই যেসব আদব বা আচরণবিধি মেনে চলতে হয়, তার পূর্ব শর্ত হলো আল্লাহর কুরআন ও রসূল সা.-এর সীরাত ও সুন্নাতের প্রতি যথাযথ আদব রক্ষা করে চলতে হবে। এ আদব রক্ষায় শুধু আনুষ্ঠানিকতা বা মৌখিকভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শনই যথেষ্ট নয়। এজন্য নিজের পড়া-শুনার মাধ্যমে হোক আর অন্য কারো আলোচনার মাধ্যমে বা সাহায্যেই হোক না কেন! আল্লাহর কুরআনের কথা অথবা আল্লাহর রাসূলের কথা হিসেবে কোনো বিষয় সামনে এসে গেলে নিঃশর্তভাবে এবং দ্বীধাহীন চিত্তে তা মেনে নিতে হবে। মেনে নেয়ার জন্য

www.bjilibrary.com

মানসিক প্রস্তুতি থাকতে হবে। কুরআন অধ্যয়নের সময় যেমন আমাদের জীবনকে সুন্দর ও উন্নত করার জন্য কোন্‌টা গ্রহণ করতে হবে আর কোন্‌টা বর্জন করতে হবে, তা চিহ্নিত করে নিজের ব্যবহারিক জীবনে তা প্রয়োগ বা বাস্তবায়নের জন্য মানসিক সংকল্প নিয়ে অধ্যয়ন করা উচিত। তেমনি রসূল সা.-এর জীবনী অধ্যয়নেরও লক্ষ্য হতে হবে তার আদর্শের আলোকে নিজেদের গড়ে তোলার চেষ্টা করা। হাদীসে রসূলের ব্যাপারে একই নিয়মনীতি এবং পথ পন্থা গ্রহণ করা উচিৎ। হাদীসে রসূলের মধ্যে আমাদেরকে যেসব কাজ করতে বলা হয়েছে যেসব গুণাবলী অর্জন করতে বলা হয়েছে, সেসব গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর যা কিছু বর্জন করতে বলা হয়েছে, যেসব কাজ বা আচরণ আল্লাহর রসূল অপছন্দ করেছেন সেগুলো বর্জনের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে।

ইসলাম একটি পূর্ণাংগ জবিন বিধান হওয়ার কারণে এর সফল ও সার্থক অনুসরণের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। আর সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রাথমিক ইউনিট হল পরিবার, পরিবার-সমূহের সামষ্টিক রূপায়ন হয়ে থাকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিষ্ঠিত আদর্শের। অতএব রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা যাদের কাম্য তাদেরকে ব্যক্তি গঠন ও পরিবার গঠনের কাজটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। পরিবারের সদস্যদের ব্যক্তিগত জীবন ও জীবনের আচরণসমূহ যদি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে গড়ে উঠে, তাহলে তাদের সামষ্টিক প্রচেষ্টায় একটি আদর্শ পরিবার যেমন গড়ে উঠতে পারে, তেমনি এক একটি আদর্শ পরিবারের সমন্বয়ে ও সামষ্টিক উপায়ে একটি আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে উঠবে এটা ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। যারা দীন প্রতিষ্ঠার জন্য নিবেদিত প্রাণ তাদেরকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

❐

www.bjilibrary.com

পারিবারিক জিন্দেগীর আদাব

পরিবারের প্রধানের পরিচয় প্রথমত একজন স্ত্রীর স্বামী হিসেবে। এরপর সন্তানের পিতা হিসেবে। একজন স্ত্রীর স্বামী হিসেবে পরিবার প্রধানকে স্ত্রীর অধিকার যথাযথভাবে আদায় করতে হবে। আবার পরিবারের দ্বিতীয় দায়িত্বশীল হিসেবে স্ত্রীকেও স্বামীর প্রতি এর দায়িত্ব কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে কুরআনের নির্দেশনা–

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ .

"স্ত্রীদেরও তেমনি অধিকার আছে যেমন তাদের উপর অধিকার আছে একে অপরের প্রতি সদাচরণ করার।"

তারা একে অপরের চক্ষুশীতল এবং আত্মিক তৃপ্তির অবলম্বন যেমন হতে পারে। তাদের ঘরের সন্তানরাও যেন আল্লাহভীরু লোকদের অনুসরণীয় আদর্শ হতে পারে। এজন্য পরস্পরকে সহায়তা প্রদান করা, একে অপরের জন্য দোআ ও শুভ কামনা করার ভাষা স্বয়ং আল্লাহই শিখিয়ে দিয়েছেন। সূরায়ে ফোরকানে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলীর আলোচনার এক পর্যায়ে তাদের দোআ ও মুনাজাতের ভাষা এভাবে উল্লেখিত হয়েছে ঃ

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا.

"হে আমাদের পরোয়ারদেগার! আমাদের স্বামী ও স্ত্রীদেরকে এবং আমাদের সন্তানদেরকে আমাদের চক্ষুশীতলকারী বানাও আর আমাদের সবাইকে মুত্তাকীদের ইমাম বা অনুসরণীয় আদর্শরূপে গড়ে ওঠার তৌফিক দাও।"

এখানে স্বামী স্ত্রীর জন্য, স্ত্রী স্বামীর জন্য এবং স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলে সন্তানের জন্য যে ভাষায় দোআ করার কথা বলা হয়েছে বাস্তবে এভাবে দোআ করে আল্লাহর তৌফিক কামনার পাশাপাশি স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে গড়ে তোলার চেষ্টা করবে। আল্লাহর পছন্দ মাফিক নিজেদেরকে গড়ে তুলতে পরস্পর একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করবে, সেই সাথে তাদের ঘরের সন্তানদেরকে আল্লাহর প্রিয় বান্দারূপে গড়ে তোলার জন্য উভয়ে মিলে যেমন আল্লাহর দরবারে দোআ করবে, তেমনি নিজেরাও

www.bjilibrary.com

পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সন্তানদেরকে যত্ন সহকারে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করবে।

আল্লাহর রাসূলের একটি ছোট্ট অথচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাণী গোটা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য গুরুত্বসহ অনুসরণ অপরিহার্য। এছাড়া শেষ নবীর উম্মত থাকার ব্যাপারে কথা থেকে যায়। এটাও পরিবার থেকেই অনুসরণ শুরু হওয়া উচিত। কথাটি হলো, "যারা বড়দেরকে সম্মান করে না ছোটদের স্নেহ করে না তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

পরিবার থেকে এই হাদীসের উপর আমল শুরু করতে হলে প্রথমত পিতা-মাতাকে সন্তানদের প্রতি দয়া-মায়া প্রদর্শনের আদর্শ স্থাপন করতে হবে। অপরদিকে সন্তানদেরকেও পিতা-মাতার প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এমনটি ভাই-বোনদের মধ্যেও একইভাবে বড়কে ছোটদের প্রতি স্নেহ মায়া-মমতার প্রতীক হতে হবে আর ছোটদের হতে হবে বড় বোন বা ভাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। পরিবারের এই অনুশীলনীর মাধ্যমে গড়ে উঠা ঐতিহ্যের ছাপ পড়তে হবে পরিবারের গণ্ডীর বাইরে নিকট আত্মীয়দের মাঝে। আত্মীয়তার সীমার বাইরে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মাঝে।

পিতা-মাতার প্রতি সদয় আচরণ এবং তাদের সেবা যত্নের নির্দেশ আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশের পরেই স্থান পেয়েছে। আল্লাহর কিতাব আল কুরআনে একাধিক স্থানে জাগতিকভাবে তাদের খেদমত ও সেবা-যত্নের যথাযথ চেষ্টা করার সাথে সাথে তাদের সাথে দরদ ভরা শ্রদ্ধাপূর্ণ আচার-আচরণের সাথে সাথে তাদের প্রতি দোআর একটা সুন্দর ভাষা আল্লাহ নিজেই শিখিয়ে দিয়েছেন ঃ

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا.

"আল্লাহ তাদের উভয়ের প্রতি (আমাদের পিতা ও মাতার প্রতি) তেমনি সদয় ও রহম কর, যেমন দয়ামায়া ও রহমদীলের সাথে তারা আমাদেরকে লালন-পালন করেছেন।"

সন্তানের পক্ষ থেকে পিতা-মাতার জন্য আল্লাহর শিখানো এই দোআটি ছিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ দোআ, বরং শ্রেষ্ঠতম দোআ। তেমনি সন্তানের জন্য পিতা মাতার দোআ ও লক্ষণীয় ঃ

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا تَقَبَّلْ دُعَاءِ.

www.bjilibrary.com

"হে পরোয়ারদেগার! আমাকে নামায কায়েমকারী বানাও। সেই সাথে আমার সন্তানদেরকেও। হে আমাদের রব! আমার এই দোআ কবুল কর।"

সাত বছর বয়স থেকে সন্তানদের নামাযে উদ্বুদ্ধ করতে বলা হয়েছে। দশ বছরে এজন্য শাসন করতে বলা হয়েছে। মা-বাবা, এ ব্যাপারে সন্তানের জন্য আদর্শ স্থাপনে সক্ষম নন। আন্তরিক দরদ দিয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করণের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নিয়ে আল্লাহর কাছে প্রাণ উজাড় করে দোআ করলে আল্লাহ সন্তানের জন্য পিতা মাতার দোআ অবশ্যই কবুল করে থাকেন। এভাবে পিতা মাতাকে অন্য কথায় পরিবারের প্রথম দ্বিতীয় ব্যক্তিকে যারা মূলত পরিবার পরিচালনায় যৌথ পার্টনার, তাদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় নিজেরা সহ সন্তানেরা মিলে একটা আদর্শ অনুসরণীয়-অনুকরণীয় পরিবার গড়ে তুলতে পারে।

ইসলামী আদব আখলাকের মূল বিষয় হলো, সকল মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার ও উত্তম আচরণ। বড়দের সাথে এই আচরণ হবে সশ্রদ্ধ ও সম্মানবোধের ভিত্তিতে। আর ছোটদের প্রতি হতে হবে সদয় ও সস্নেহের আচরণ। এই আচরণের বিষয়টি হাদীসে রাসূলে এভাবে এসেছে ঃ

اَلدِّيْنُ نُصْحٌ قِيْلَ لِمَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ وَالْكِتَابِهٖ وَلِاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَلِعَامَّتِهِمْ.

"(রসূল সা. বলেছেন,) দীন হলে নছিহত বা পরস্পরের শুভ কামনা। (সাহাবায়ে কেরাম রা. জানতে চাইলেন) কার জন্য হে আল্লাহর রসূল! রসূল স. উত্তরে বললেন, আল্লাহর জন্য, আল্লাহর রাসূলের জন্য, আল্লাহর কিতাবের জন্য, মুসলিম উম্মাহর নেতৃবৃন্দের জন্য এবং সর্বসাধারণ মুসলিম জনতার জন্য।"

এখানে আল্লাহর জন্য কথার অর্থ কোনো পার্থিব লাভ ও স্বার্থ চিন্তা ছাড়া আল্লাহর রসূলের ও কিতাবের হেদায়াতের আলোকে। আল্লাহর রসূলের আদর্শকে আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ এবং অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনের জীবন্ত নমুনা হিসেবেই বিবেচিত হয়ে আসছে।

www.bjilibrary.com

আল্লাহর কিতাব ও রসূলের জীবনাদর্শের আলোকে নিছক আল্লাহকে রাজী খুশি করার উদ্দেশ্যে পার্থিব কোনো স্বার্থ বা প্রতিদানের আশা ব্যতিরেকে মুসলিম উম্মাহর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরসহ সর্বস্তরের জনমানুষের কল্যাণ কামনাই দ্বীন ইসলামের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আর এই আচার-আচরণের বাস্তব শিক্ষা লাভের, চর্চার ও অনুশীলনীর মূল কেন্দ্র একটি মুসলিম পরিবার, যাকে বলা হয় সমাজের প্রাথমিক ইউনিট। প্রত্যেক মুসলিম পরিবারকে ইসলামী আদব ও আখলাকের শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত করতে হলে আল্লাহর শিখানো তার প্রিয় বান্দাদের দোআর তাৎপর্য অনুধাবন করে আল্লাহর সাহায্য কামনা করে দোআ করতে হবে। তেমনি ঐ দোআয় আল্লাহর কাছে যা চাওয়া হয়, তা অর্জনের জন্য নিজেদেরকে বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। স্বামী স্ত্রীকে আল্লাহর বাঞ্ছিত মানে গড়ে তোলার যেমন চেষ্টা করবে তেমনি স্ত্রীও স্বামীকে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করবে। উভয়ে মিলে চেষ্টা করবে সন্তানদেরকে হৃদয় ও চক্ষুশীতলকারী হিসেবে। সেই সাথে সকলের সমন্বিত চেষ্টা হতে হবে নিজেদের পরিবারটি ঈমানদার আল্লাহভীরু বা মুত্তাকি লোকদের অনুকরণীয় অনুসরণীয় আদর্শ পরিবার রূপে। এরূপ পরিবারের সদস্যই গোটা মুসলিম উম্মার জন্য সাধারণভাবে, আর নেতৃস্থানীয়দের জন্য বিশেষভাবে শুভ কামনা, কল্যাণ কামনার হক আদায় করতে সক্ষম হয়ে থাকে বা হতে পারে। অতএব ইসলামী উম্মার জন্য উম্মাহ হিসেবে সামষ্টিক দায়িত্ব পালনের জন্য যে ধরনের ব্যক্তি গঠন অপরিহার্য, তার প্রাথমিক ট্রেনিং সেন্টার হিসেবে একটি মুসলিম পরিবারকে গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। মুসলিম উম্মার মূল ভিত্তি ও শক্তির উৎসকে যারা ধ্বংস করতে চায়, বর্তমান বিশ্বের সর্বত্র তাদের ধরন প্রকৃতির গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে যে সত্যটি ধরা পড়ে তাহলো তারা সেবার নামে, সাহায্য সহযোগিতার নামে, আমাদের পারিবারিক বন্ধনকে শিথিল করতে চায়। চায় পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করতে। সে ব্যাপারে নেতৃস্থানীয় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলরা একেবারেই উদাসীন।

❐

www.bjilibrary.com

সালাম ও মুসাফাহার আদাব

আমরা একটু আগে হাদীসে রসূল সা.-এর আলোকে আলোচনা করে এসেছি, একে অপরের কল্যাণ কামনা করার, শুভ কামনা করা দ্বীন ইসলামের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সারনির্যাস। এভাবে পারস্পরিক কল্যাণ ও শুভ কামনার লক্ষ্যেই ইসলামে সালাম ও মুসাফাহার প্রচলন করা হয়েছে স্বয়ং আল্লাহর নির্দেশে। এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়েছেন মুহাম্মদ সা. তার নিজের পক্ষ থেকে এটাকে কাজে পরিণত করে। সেই সাথে এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেও দিয়ে গেছেন অসংখ্য নির্দেশনা। বেশী বেশী সালাম দেয়া (মানুষের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষণের দোআ) ও খানা খাওয়ানোকে তিনি উত্তম ইসলাম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। পরিচিত অপরিচিত যে কোনো মুসলমানের দেখা সাক্ষাত হলেই "আস্‌সালামু আলাইকুম" বলার মধ্যে যেমন আগন্তুকের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি কামনা করা হয়ে থাকে, তেমনি একে অপরের সাথে মুসাফাহা বা করমর্দনের সময় যে দোআ করতে হয়, يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ "আল্লাহ আমাদেরকে ও আপনাদেরকে ক্ষমা করুন।" এভাবে একে অপরের ভুলত্রুটি গুনাখাতা মাফ করার জন্য আল্লাহর দুই বান্দার হাতে হাত রেখে যখন দোআ করেছেন তারই রসূলের শিখানো পদ্ধতি অনুসরণ করে, তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সদয় ক্ষমাশীল ও সন্তুষ্ট না হয়ে পারেন না।

আবু ইউসুফ আবদুল্লাহ ইবনে সালাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল সা.-কে বলতে শুনেছি, "হে মানব মণ্ডলী! তোমরা তোমাদের মাঝে সালাম দেয়ার প্রচলন করো, মানুষকে খাবার খাওয়াও, আত্মীয়তার বন্ধন সংরক্ষণ করো, আর নামায আদায় করো (সেই গভীর রাতে) যখন অন্য মানুষ থাকে ঘুমন্ত অবস্থায়, তাহলে তোমরা নিরাপদ স্বাচ্ছন্দে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।" (তিরমিযি)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা.-কে জিজ্ঞেস করলো কোন্ ইসলাম সর্বোত্তম ? রসূলুল্লাহ সা. উত্তরে বললেন "মানুষকে খাবার খাওয়াও ও সালাম প্রদান কর। তোমার পরিচিত অপরিচিত নির্বিশেষে।" (বুখারী, মুসলিম)

www.bjilibrary.com

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রসূল সা. বলেছেন, তোমরা কেউ সত্যিকার অর্থে ঈমানদার না হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, আর ঈমানদারও হতে পারবে না যদি না পরস্পর একে অপরকে ভালো না বাসেন। আমি কি তোমাদের সেই বিষয়ে অবহিত করবো না ? যে বিষয় অবলম্বন করলে তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসতে অভ্যস্থ হবে ? আর তাহলো নিজেদের মধ্যে ব্যাপকভাবে সালামের প্রচলন করতে হবে।" (মুসলিম)

সালামে ব্যবহৃত বাক্য হতে হবে السلام عليكم। (আস্‌সালামু আলাইকুম) "আপনার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও কল্যাণ বর্ষিত হোক।" আবু দাউদ ও তিরমিযি হাদীসের এই উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের বর্ণনা মতে হযরত আবু জুরারা আল জুহনী রা. নামক একজন সাহাবী বলেছেন, "আমি একদা আল্লাহর রসূল সা.-এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলাম, السلام عليك। (আস্‌সালামু আলাইক) আল্লাহর রসূল সা. বললেন, এভাবে আলাইকাসসালাম বলবে না, এটা মৃত ব্যক্তিদের সম্ভাষণ।"(আবু দাউদ ও তিরমিযি)

❐

www.bjilibrary.com

সালামের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় রীতি

মুসলিম শরীফ ও বুখারী শরীফ প্রসিদ্ধ এই দুই হাদীস গ্রন্থেই বর্ণিত হাদীসে সালাম আদান প্রদানের ক্ষেত্রে কে কাকে আগে সালাম দেবে এ ব্যাপারে হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত হাদীসে বর্ণনা এরূপ ঃ

"কোনো যান বাহনে আরোহিত ব্যক্তি পায়ে হাঁটা ব্যক্তিকে আগে সালাম দেবে, হেঁটে আসা ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে আগে সালাম দেবে। অল্প লোকের কোনো গ্রুপ এর সামনে অধিক সংখ্যক লোকদের জামায়াতকে আগে সালাম দেবে।" বুখারীতে অতিরিক্ত উল্লেখ আছে, "কম বয়সের লোকেরা বেশী বয়স্ক লোককে আগে সালাম দেবে।"

একই সমাবেশে মুসলিম অমুসলিমের মিশ্রণ থাকলে সেখানেও আস্‌সালামু আলাইকুম বলে সালাম প্রদানে কোনো অসুবিধা নেই। বুখারী ও মুসলিম উভয় হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ আছে হযরত উসমান রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সা. এমন একটি মজলিস অতিক্রম করলেন যেখানে মুসলিম ও মুশরিক একত্রিত ছিল, এমনকি ইয়াহুদী এবং অগ্নি উপাসকও ছিলো। আল্লাহর রসূল দেখে তাদের সবার প্রতি সালাম জানালেন।

বুখারী শরীফের বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে, আবদুল খাত্তাব কাতাদাহ বলেছেন, "আমি আনাস রা.-কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূল সা.-এর সময় কি মুসাফাহা বা পরস্পরিক করমর্দনের প্রচলন ছিল ? তিনি বললেন, হাঁ, ছিল।"

আবু দাউদ হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ আছে হযরত বারায়া রা. বলেন, রসূল সা. বলেছেন, "দুইজন মুসলমান যথাযথ একত্রিত হয় ও মুসাফাহা করে, তাহলে তাদের উভয়ে একে অপরকে বিদায় নেয়ার আগে আল্লাহ তাআলা তাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেন।"

মানব সভ্যতার ইতিহাসে এভাবে সালাম ও মুসাফাহার মাধ্যমে একে অপরের কল্যাণ ও শুভ কামনার আর কোনো সুন্দরতম দৃষ্টান্ত আছে বলে আমার জানা নেই।

❐

www.bjilibrary.com

সামাজিকতায় ইসলামী আদব

সামাজিক দায়িত্ব পালন ও যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে একে অপরের সাথে দেখা সাক্ষাত ও যোগাযোগ অবশ্যই করতে হবে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব হবার কারণে এর কোনো বিকল্প নেই। তবে এই যোগাযোগ বল্গাহীনভাবে, অবাধে যার যার খুশিমত যখন তখন করার ফলে সমাজে কোনো অঘটন ঘটতে পারে। মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের নিজস্ব ঐতিহ্য ক্ষুণ্ন হতে পারে। মান-মর্যাদায় কারো আঘাতও লাগতে পারে। এসব অবাঞ্ছিত অনাকাংখিত পরিস্থিতি যাতে সৃষ্টি হতে না পারে, পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধের কোনো অবনতি না ঘটতে পারে, বা পবিত্রতা ক্ষুণ্ন না হতে পারে এজন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সূরায়ে নূরের মাধ্যমে বিশেষ তাকিদসহ হেদায়াত এসেছে।

মানুষের সুন্দর জীবনযাপনের জন্য ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে মৌলিক দু'টি দায়িত্ব পালন সমান্তরালভাবে অপরিহার্য। একটি স্রষ্টার ইবাদত, আর অপরটি সৃষ্টির খেদমত। যা সাধারণত হক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক এবং হক্কুল ইবাদ অর্থ বান্দার হক হিসেবে পরিচিত। তৌহিদের সার কথাও হলো, এক আল্লাহ ছাড়া মানুষের নিরংকুশ ইবাদত বা আনুগত্য আর কেউ পেতে পারে না। এভাবে যারা এক আল্লাহর প্রভুত্ব, সার্বভৌমত্ব ও নিরংকুশ ক্ষমতা প্রতিপত্তির স্বীকৃতি দিয়ে কেবলমাত্র তারই ইবাদতে অভ্যস্ত হয়, তারা অবশ্যই পরিণত হয় পরস্পর একে অপরের ভাই হিসেবে। তাদের কেউ কারো প্রভুও নয়, গোলামও নয়, বরং আল্লাহর বান্দা এবং পরস্পরের ভাই। আল্লাহর বান্দা হিসেবে আল্লাহর হক আদায় করার অর্থাৎ শিরকমুক্তভাবে একমাত্র তারই ইবাদত করা যেমন মুসলমান হিসেবে আমাদের অবশ্য করণীয় দায়িত্ব, তেমন বান্দার হক বা অধিকার আদায় ও সংরক্ষণের দায়িত্ব পালনও অপরিহার্য। এ দায়িত্বের সূচনা হয় অবশ্য পরিচয় থেকেই। স্বামী হিসেবে স্ত্রীর হক বা অধিকার আদায় করা। স্ত্রী হিসেবে স্বামীর অধিকার আদায় করা। পিতামাতা হিসেবে সন্তানের অধিকার আদায় করা। সন্তান হিসেবে পিতামাতার অধিকার আদায় করা। ভাই বোনদের মধ্যে পারস্পরিকভাবে একে অপরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন এই পার্যায়েই এসে যায়।

www.bjilibrary.com

এই ধারাবাহিকতায় নিকট আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীর হকও আদায় করতে হবে। পরিচিত-অপরিচিত, আত্মীয়-অনাত্মীয় সর্বস্তরের মানুষের প্রতিই দায়িত্ব পালন ইসলামী জীবন যাপনের অন্তর্ভুক্ত। এই দায়িত্ব পালন করতে গেলে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ দেখা সাক্ষাত অবশ্যই করতে হবে। এই ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার নির্দেশনা কি তা জানতে হবে এবং সে অনুযায়ী যোগযোগ করতে হবে। এটাই আল্লাহর এবং রসূলের পছন্দনীয় আমল আখলাক বা আচার আচরণ।

এ সম্পর্কে সূরায়ে নূরের ২৭, ২৮ এবং ২৯ নম্বর আয়াতের নির্দেশনা অত্যন্ত পরিষ্কার এবং বাস্তবসম্মত। আল্লাহ বলেন, নিজের ঘর ছাড়া অন্যের ঘরে বা বাড়ীতে, তাদের কাছ থেকে অনুমতি বা সম্মতি ছাড়া তাদের মাঝে সালাম বিনিময় ছাড়া প্রবেশ করো না, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। যাতে তোমরা আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক আমল করতে সক্ষম হও।" এখানে মূলত যাতে হঠাৎ করে বাড়ীতে প্রবেশ করার কারণে কোনো পক্ষকেই কোনো বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে না হয়, এমন বাঞ্ছিত অনাকাংখিত পরিস্থিতি থেকে উভয় পক্ষকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার জন্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে এই বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কিছু নিসস্ব ব্যাপার অবশ্যই থাকতে পারে যা অন্য কারও নজরে আনা তারা সমীচীন মনে নাও করতে পারে। কোনো ব্যক্তি বা পরিবারের জন্য যেকোনো সময় মেহমানকে গ্রহণ করার মত অনুকূল পরিবেশ নাও থাকতে পারে। তাই কারো সাথে দেখা সাক্ষাতের আগে কোন্ সময়টি তাদের জন্য পছন্দের বা স্বাচ্ছন্দের আর কোন্ সময়টি তাদের পছন্দের বা স্বাচ্ছন্দের নয়, এটা জেনে নেয়াকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আধুনিক যুগে যেটা কার 'প্রাইভেসী' রক্ষার কথা বলা হয়ে থাকে, আল কুরআনের এই নির্দেশের মাধ্যমে তারই নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে, "যদি সেখানে কাউকে না পাও তাহলে অনুমতি পাওয়া ছাড়া সেখানে প্রবেশ করবে না। আর যদি তোমাকে ফিরে যেতে বলা হয়, তাহলে তুমি ফিরেই আসবে। এটাই তোমাদের জন্য পবিত্র কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে। তোমরা যা কিছু প্রকাশ কর, আর যা কিছু গোপন কর আল্লাহ তায়ালা সব বিষয়ে পূর্ণভাবে ওয়াকেফহাল।"

www.bjilibrary.com

এভাবে মানুষের সমাজকে যাবতীয় ফেতনা থেকে, পাপ-পংকিলতা থেকে, সামাজিক নিরাপত্তার স্বার্থে আল্লাহ তায়ালা নিকট আত্মীয় বা যাদের সাথে বিবাহ শাদী বৈধ নয় এমন ব্যক্তিদের ছাড়া খোলামেলা দেখা সাক্ষাতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। তারা স্বাভাবিকভাবে সমাজে বিচরণের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়কে দৃষ্টি সংযত করে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। বলা হয়েছে ঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ـ

"হে নবী ! আপনি মু'মিন পুরুষদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে চলে (নীচু করে)। আর লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই হবে তাদের পবিত্র আচরণের অবলম্বন ; আল্লাহর তাদের সকল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক অবগত বা অবহিত।"–সূরা আন নূর ঃ ৩০

অনুরূপভাবে মুমিন নারীদের উদ্দেশ্যেও বলা হয়েছে ঃ

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ص

"হে নবী মুমিন নারীদেরকেও বলে দিন তারাও যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে চলে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। তাদের সৌন্দর্যের প্রকাশ না ঘটায়, তবে যা স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায় সেটা ছাড়া। আর তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে মাথা থেকে বুক পর্যন্ত আবৃত করে রাখে।"–সূরা আন নূর ঃ ৩১

এভাবে নারী-পুরুষের মধ্যে একটা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলার জন্য যে পর্দা বা হিজাবের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা একটি সমাজের পবিত্রতার জন্য একান্ত অপরিহার্য। একে অপরের বাড়ীতে দেখা সাক্ষাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ যে নিয়মনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন একটি সুসভ্য মানব সমাজের জন্য তাই বাস্তবসম্মত। পর্দা বা হিজাবের কার্যকারিতা শুরু হয় এখান থেকেই। এরপর নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য, বরং পুরুষের ব্যাপারেই আগে এসেছে যে নির্দেশটি তাহলো দৃষ্টি সংযত করে চলা। পর্দা বা

www.bjilibrary.com

হিজাবের মূল স্পিরিট তাই এই নির্দেশের মধ্যে নিহিত রয়েছে। মানব সমাজে অনেক অঘটনের কারণ হয় অসংযত দৃষ্টিকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হওয়া ফেতনা থেকে। মানুষের দৃষ্টিকে বিষাক্ত তীরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এই বিষাক্ত তীরের আঘাত থেকে নিরাপত্তা বিধানের জন্য আল্লাহ তায়ালা নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতি সমান গুরুত্বসহ দৃষ্টি সংযত ও লজ্জাস্থানের হেফাজতের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। নারীর প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি নারীর দৃষ্টি কোথায় নিবদ্ধ হলে ফেতনার সৃষ্টি হতে পারে এটার ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। মানুষের সৌন্দর্যের কেন্দ্র বিন্দু মুখমণ্ডল এবং চোখের আকর্ষণীয় চাহনী।" অসংযত দৃষ্টি বিষাক্ত তীরের মত আঘাত হানে এখানেই বা আহত হয় এই বিষাক্ত তীরের আঘাতেই। অতএব সূরায়ে নূরের দৃষ্টি সংযমের নির্দেশনার গুরুত্ব উপলব্ধি করেই পর্দা বা হিজাবের হক আদায় করতে হবে।

হযরত আবু মূসা আশয়ারী রা. বর্ণিত বুখারী ও মুসলিম উভয় কিতাবে উল্লেখিত হাদীসে বলা হয়েছে, কারো বাড়ীতে যাবার জন্য বা প্রবেশের জন্য তিনবার অনুমতি চাইতে হবে। অতঃপর অনুমতি পাওয়া গেলে প্রবেশ করবে নতুবা ফিরে যাবে।

হযরত সহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত এবং বুখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখিত হাদীসে অনুমতি নিয়ে কারো বাড়ীতে প্রবেশের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। একমাত্র দৃষ্টি সংযমের জন্য বা দৃষ্টির হেফাজতের জন্যই অনুমতি নেয়াকে অপরিহার্য করা হয়েছে।

রবি'ই বিন হারাস থেকে বর্ণিত আবু দাউদে উল্লেখিত হাদীস থেকে জানা যায়। বনী আমেরের এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, তিনি রসূল সা.-এর বাসগৃহে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন তখন রসূল সা. নিজের বাসগৃহে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর রসূল সা. তাকে তার বাসগৃহে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। এরপর রসূল সা. তার খাদেমকে বললেন, ঐ লোকটির কাছে যাও। অতঃপর তাকে শিখাও কিভাবে অনুমতি নিতে হয়। তাকে বলো, "প্রথমে সালাম জানাও, তারপর অনুমতি চেয়ে বাসগৃহে প্রবেশ করতে পারি কি ? লোকটি রসূলের খাদেমের মুখে এ নিয়ম শুনে তারপর রসূল সা.-কে লক্ষ্য করে বলেন, السلام عليكم। তারপর জানতে চাইল প্রবেশ করতে পারি কি ? অতঃপর রসূল সা. তাকে অনুমতি দিলেন এবং তিনি রসূল সা.-এর বাসগৃহে প্রবেশ করলেন।

www.bjilibrary.com

হযরত মিকদাত ইবনে সাহাল বলেন, "আমি রসূলকে সালাম না দিয়ে আসায় তিনি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন, আগে সালাম দাও তারপর প্রবেশের জন্য অনুমতি চাও"। বুখারী শরীফের অপর একটি হাদীসে উল্লেখ আছে, তোমাদের কেউ যদি তিনবার অনুমতি চেয়েও অনুমতি না পায় তাহলে যেন সে ফিরে যায়।

তাবারানী শরীফের একটি হাদীসে বলা হয়েছে, কেউ তার বাড়ীতে গেলে বাড়ীর মালিক যেখানে বসতে দেয় সেখানেই বসতে হবে। কারণ বাড়ীর মালিকই ভালো জানে তার অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ও প্রাইভেসি সম্পর্কে।

আবু দাউদ শরীফের একটি হাদীসে বলা হয়েছে, যখন দু'জন মুসলমান একত্রিত হয় অতঃপর মোসাফাহা করে, আল্লাহর প্রশংসা করে এবং আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফের জন্য দোআ করে তাদের দু'জনকেই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেন।

তাহাবী শরীফের একটি হাদীসে বলা হয়েছে, "যখন তোমরা পরস্পরের সাথে দেখা সাক্ষাত করবে তখন সালাম ও মুসাফাহাসহ পরস্পরকে গ্রহণ করবে। আর সাক্ষাত শেষে যখন বিদায় নেবে তখন একে অপরের জন্য গুনাহ মাফের দোআ করবে।"

মুসলিম শরীফের একটি হাদীসের সতর্কবাণীটি এক্ষেত্রে সবার সামনে রাখা জরুরী, সতর্কবাণী মূলক হাদীসটিতে বলা হয়েছে, অন্য কারো বাড়ীতে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করে বা কিছু দেখা ও জানার চেষ্টা করে, ঐ বাড়ীর মালিকের জন্য উক্ত ব্যক্তির চোখ ফুটো করে দেয়া বৈধ হবে।

❐

www.bjilibrary.com

মজলিসের আদব

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব হওয়ার কারণে তাদেরকে কখনও সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক বৈঠকাদিতে বসতে হয়। ইসলামের মূল কথা যেহেতু মানব সমাজকে একটি সুনিয়ম, সুশৃংখল সমাজ হিসেবে গড়ে তোলা এবং পরিচালনা করা। তাই যেকোনো প্রকারের বৈঠকাদিও যাতে সুনিয়ম, সুশৃংখলভাবে পরিচালিত হতে পারে সে জন্যও আল্লাহ এবং রসূলের পক্ষ থেকে বাস্তবসম্মত দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

সূরা মুজাদালার ১১ আয়াতটি এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ج وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا .

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদেরকে যখন কোনো মজলিসে অপরের জন্য জায়গা করে দেয়ার জন্য বলা হয়, তখন মজলিসের মাঝে জায়গা করে দেয়ার ব্যবস্থা করো। আল্লাহ তোমাদের প্রশস্ত জায়গা দান করবেন। আর যখন মজলিসের কার্যক্রম শেষে তোমাদেরকে মজলিস থেকে চলে যেতে বলা হয় তখন মজলিসের স্থান ত্যাগ করে চলে যাবে।"

বুখারী ও মুসলিম দুটি প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে অভিন্ন বর্ণনায় বলা হয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূল সা. বলেন, "তোমাদের কেউ যেন কাউকে তার বসার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে কোনো মজলিসে গিয়ে সেই জায়গায় নিজে না বসে, বরং একটু প্রশস্ত করে কাউকে না সরিয়ে বসার জন্য স্থান করা হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর কোনো মজলিসে গেলে তার জন্য কেউ উঠে দাঁড়িয়ে জায়গা ছেড়ে দিলে তিনি সেখানে বসতেন না।"

কোনো মজলিসে যাতে বসতে মানুষের কষ্ট না হয়, এজন্য বৈঠকের আরো লোকদের খেয়াল রাখা উচিত। আল্লাহর রসূলের ভাষায় সেই মজলিসই উত্তম যেটা প্রশস্ত (আগন্তুকদের জন্য যথেষ্ট)।

www.bjilibrary.com

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সা. বলেছেন কেউ যদি এমন কোনো মজলিসে বসে যেখানে আখেরাতে ফায়দা হবার মত কোনো আলোচনাই হয়নি উক্ত মজলিস থেকে উঠে আসার সময় বা উক্ত মজলিস ত্যাগের সময় যদি এই দোআটি পাঠ করে ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ـ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ ـ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ

তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা এরূপ মজলিসে বসায় যাবতীয় গুনাহ খাতা মাফ করে দেবেন। হাদীসটি তিরমিযি শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে। যার সার নির্যাস হলো দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের জন্য কল্যাণের কামনায়ই ঈমানদার লোকেরা কোনো মজলিসে বসবে। যেখানে আখেরাতের কোনো কল্যাণের কথা আলোচনা হয় না সেটা পরিহার করবে। নতুবা উক্ত দোআর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে আরো বর্ণিত আছে, রসূল সা. এমন খুব কম মজলিসেই যোগদান করেছেন যেখান থেকে বিদায়ের মুহূর্তে নিম্নোক্ত দোআটি করেননি। অধিকাংশ মজলিস থেকে বিদায়ের আগে তিনি এ দোআটি করেই বিদায় হতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ ـ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيْبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِاَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا اَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا ـ وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِىْ دِيْنِنَا وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا. ترمذى

"হে আল্লাহ আমাদের জন্য তোমার ভয়ভীতি এমনভাবে দান করে দাও যাতে তা তোমার নাফরমানী আমাদের মাঝে বাধা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। আর এমনভাবে তোমার আনুগত্য করার তৌফিক দাও যার মাধ্যমে আমাদের জান্নাতে পৌছতে সক্ষম হয়। আমাদের মাঝে

www.bjilibrary.com

এমন সুদৃঢ় বিশ্বাস বা ইয়াকিন সৃষ্টি করে দাও যার ফলে দুনিয়ার যাবতীয় বিপদ, মুছিবত সহজ হয়ে যায়। হে আল্লাহ! আমাদের যতদিন জীবিত রাখ আমাদের শ্রমশক্তি, দৃষ্টিশক্তিসহ শারীরিক শক্তিতে সক্ষম থাকতে বিশেষভাবে শক্তি যোগাও। এই সম্পদকে আমাদের উত্তরাধীকারীদেরও দান কর। দ্বীনের মধ্যে (ব্যাপারে) আমাদেরকে মুছিবতে ফেল না। দুনিয়ার এই পার্থিব জীবনকে আমাদের প্রধান চাওয়া পাওয়া বানিও না, আমাদের জ্ঞানের চূড়ান্ত লক্ষ্য বানিও না, আমাদের প্রতি সদয় আচরণ করবে না এমন কাউকে আমাদের উপর চাপিয়ে দিও না।"

এই দোআটি খুবই অর্থবহ এবং তাৎপর্যপূর্ণ। এর অর্থ বুঝে হৃদয়ের গভীরে তালা বন্ধ করলে একজন ঈমানদার মানুষ তার ঈমানের দাবি পূরণের শক্তি নিজের মধ্যে অবশ্যই উপলব্ধি করবে।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, "যদি কোনো মানবমণ্ডলী কোনো বৈঠকে মিলিত হয় আর সেখানে আল্লাহর কথা আলোচিত না হয়, তাহলে তারা যেন একটি মৃত গাধার কাছ থেকে উঠে আসলো, আর এটি হবে তাদের জন্য দারুণ অনুতাপ, অনুশোচনার বিষয়।"(আবু দাউদ)

আবু দাউদ ও তিরমিযিতে উল্লেখিত এবং আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে, "রসূল সা. বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন কোনো মজলিসের কাছে পৌঁছে যায় বা উপস্থিত হয় তখন যেন মজলিস-বাসীদেরকে সালাম জানায়। যখন বিদায় নিতে চাইবে তখনও সালাম জানাবে। প্রথম ব্যক্তি এখানে শেষ ব্যক্তি থেকে অগ্রাধিকার পাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই।"

বুখারী শরীফের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত রসূল সা. বলেছেন, "নেক লোকের সাহচর্য মূলত সুগন্ধ ব্যবসায়ী বা বিতরণকারীর পাশে বসার মত। উক্ত ব্যক্তি যদি তার সুগন্ধি দ্রব্য থেকে তোমাকে কিছু নাও প্রদান করে, তবুও তুমি তার সাথে রাখা সুগন্ধি দ্রব্যের সুবাতাস অবশ্যই লাভ করবে। আর খারাপ লোকের সাহচর্য্যকে তুলনা করা যায় লোহার কামারের ব্যবহৃত হাঁপরের পাশে বসার সাথে, উক্ত হাঁপরের আগুন যদি তোমাকে স্পর্শ নাও করে তবুও তার দুর্গন্ধ তোমাকে অবশ্যই কষ্ট দেবে।"

❐

www.bjilibrary.com

মেহমানদারীর আদব

অতিথি বা মেহমানকে আদর অভ্যর্থনা করা ইসলামী সামাজিকতার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক। এটা মুসলিম উম্মার দীর্ঘ ইতিহাস ঐতিহ্যের অংশ। মেহমানদের সাথে কি ধরনের সৌজন্য ও সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করতে হবে, করা উচিৎ আল্লাহর রসূল সা. এ ব্যাপারে যেমন উপদেশমূলক নির্দেশনা দিয়েছেন, তেমনি নিজে বাস্তবে এর নজিরও স্থাপন করে গেছেন। আল্লাহর রাসূলের শিক্ষার ফলে সাহাবায়ে কেরাম রা. থেকে শুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত ইসলামী আদর্শের সার্থক অনুসারীগণ মেহমান আপ্যায়নের সুযোগকে একটি সৌভাগ্যজনক সুযোগ মনে করে আসছেন। আগন্তুককে বলা হয় মেহমান। আর মেহমানকে আপ্যায়ন যে করে তাকে বলা হয় মেজবান। ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার আলোকে এই মেজবান এবং মেহমান উভয়ের জন্য কিছু পালনীয় আচরণবিধি রয়েছে। যা মেনে চলা ইসলামী, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতিতে অপরিহার্য। এক্ষেত্রে আমরা রসূল সা.-এর কয়েকটি হাদীসকে সামনে রেখে আলোচনা করব। বুখারী ও মুসলিম হাদীসের এই প্রসিদ্ধ দুটি কিতাবেই হযরত আবু হুরায়রা রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রসূল সা. বলেছেন, "যে বা যারা আল্লাহর উপর ও আখেরাতের উপর ঈমান পোষণ করে, তার উচিত মেহমানকে যথাযথ সম্মান করা। যে বা যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান এনেছে তাদের উচিত আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট অক্ষুণ্ন রাখা, যে বা যারা আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমানের দাবীদার সে বা তারা যেন কথা বললে ভালো ভালো কথা বলে, নতুবা চুপ থাকে।"

হাদীসে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ এসেছে তবে প্রথমে স্থান পেয়েছে মেহমানকে সম্মান করার বিষয়টি। মেহমান আত্মীয়ও হতে পারে অনাত্মীয়ও হতে পারে। আত্মীয়তার বন্ধন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মেহমানদারীর একটা প্রভাব প্রতিক্রিয়া অবশ্যই কাজ করে থাকে। মানুষের মুখের কথা মনের প্রতিধ্বনি হিসেবেই বিবেচিত হয়ে থাকে। মানুষের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে যেসব মার্জিত ও শালিন ভাষার একটা বড় ভূমিকা থাকে

www.bjilibrary.com

তেমনি সম্পর্কের অবনতি ঘটানোর ক্ষেত্রেও মানুষের কটূক্তি, অসৌজন্যমূলক কথাবার্তাই দায়ী হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। তাই আল্লাহর রসূল অত্যন্ত গুরুত্বসহ বলেছেন, কথা বললে ভালো কথা বলবে, না হয় চুপ থাকবে। কুরআন শরীফেতো আল্লাহ তা'আলা 'দান করে খোটা দেয়ার চেয়ে উত্তম কথা বলাকেই' অধিকতর ভাল কাজ হিসেবে উল্লেখ করেছেন ঃ

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا اَذًى. البقرة : ٢٦٣

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবি শুরাইহ খুয়ালাদ ইবনে আমর আল খোজায়ী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি রসূল থেকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, যে বা যারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী সে বা তারা যেন মেহমানকে তার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যথাযথ সম্মান করেন। সাহাবায়ে কেরামের জিজ্ঞাসার জবাবে রসূল সা. বলেন, একদিন এবং এক রাত। আর মেহমানদারীর সর্বোচ্চ সময় তিন দিন। (দিবা রাতিসহ) এর অতিরিক্ত হলে সেটা সাদাকা হিসেবে পরিগণিত হবে।"

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় অতিরিক্ত এই কথাগুলো এসেছে, "কোনো মুসলমানের জন্য তার ভাইয়ের বাড়ীতে এত সময় অবস্থান করা উচিত নয়, যাতে মেজবানকে গুনাহে লিপ্ত হতে হয়। সাহাবায়ে কেরাম রা. জানতে চাইলেন "কিভাবে তাকে গুনাহে লিপ্ত করা হয় ?" এমন অবস্থায় কারো বাড়ীতে মেহমান হিসেবে অবস্থান করা যখন মেজবানের কাছে মেহমানকে আপ্যায়ন করার মত কোনো কিছু না থাকে। অর্থাৎ মেজবানের সঙ্গতির প্রতি অবশ্যই মেহমানকে খেয়াল রাখতে হবে এবং তার সঙ্গতি অসঙ্গতিকে বিবেচনায় রেখে কতক্ষণ অবস্থান করবে না করবে, অথচ আদৌ অবস্থান করবে কিনা তার সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

মেহমান থেকে কোনো প্রকার খেদমত নেয়াকে আল্লাহর রসূল নিষেধ করেছেন। মেহমানদারি করতে হবে একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে আল্লাহকে রাজী খুশী করার জন্য। এর বিনিময়ে মেহমান থেকে কোনো কিছু প্রত্যাশা করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে তাহাবী শরীফের বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

"রসূল সা. মেহমান থেকে কোনো প্রকার খেদমত নিতে নিষেধ করেছেন।" কেউ কোথাও (আত্মীয় অনাত্মীয় নির্বিশেষে) মেহমান হলে

www.bjilibrary.com

তাদের কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে কোনো নফল রোজা রাখতে পারবে না। উক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ছয়টি সহীহ হাদীস গ্রন্থের অন্যতম হাদীসগ্রন্থ তিরমিযি শরীফে।

মেহমানকে বিদায় জানানোর জন্যে মেজবানের জন্য তার নিজ বাড়ীর দরোজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়া সুন্নত তরিকার অন্তর্ভুক্ত। (বায়হাকী)

www.bjilibrary.com

খানাপিনার আদব

ইসলামী আদর্শই আসলে মানব সমাজকে পশুত্ব ও পাশবিকতামুক্ত একটি সুসভ্য ও মার্জিত পরিশিলীত সমাজে পরিণত করতে পারে। যুগে যুগে আগত নবী-রসূলগণের এবং তাদের সাথে আগত আসমানী কিতাব ও সহীফার শিক্ষার ফলেই মানুষ সভ্যতার সাথে পরিচিত হয়েছে এবং পশু প্রাণীর চেয়ে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন হতে সক্ষম হয়েছে। কথায় বলে নদী মরে গেলেও রেখা থাকে। বিশ্বের এমন কোনো স্থান নেই বা এমন কোনো জাতি গোষ্ঠী নেই যাদের কাছে কোনো না কোনো সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নবী বা রসূলই আসেননি। নবী এবং রসূল মানুষকে সৃষ্টির সেরা আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদায় ভূষিত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অবশ্যই এসেছেন। মানুষ পরবর্তী পর্যায়ে তাদের শিক্ষা থেকে বিপথগামী হয়েছে। এরপরও আজকের বিশ্বে মানবতা মনুষত্বের ন্যায় ও সত্যের যতটুকু শিক্ষা বেঁচে আছে, তা বিভিন্ন সময়ে আগত নবী-রসূলদের শিক্ষারই ধারাবাহিকতা। যার পরিপূর্ণতা ও স্বার্থক বাস্তবায়ন হয়েছে আল্লাহর সর্বশেষ নবী এবং সর্বশেষ কিতাবের মাধ্যমে। রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বোচ্চ বিধি বিধানসহ সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তি জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়সমূহকেও তাই পরিমার্জিতভাবে আনজাম দেয়ার জন্য আল্লাহর নির্দেশ রয়েছে। আর সে নির্দেশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রসূল সা. বাস্তব প্রশিক্ষকের (Practical demonestator) ভূমিকা পালন করে গেছেন। মানুষের জীবন ধারণের জন্য খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ অপরিহার্য। এক্ষেত্রে যেমন হালাল হারাম বা বৈধ অবৈধতার বিষয়টি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় তেমনি খানাপিনার ক্ষেত্রে কিছু নিয়মপদ্ধতি মেনে চলাও অপরিহার্য।

এক্ষেত্রে কুরআন থেকে ছোট দুটি আয়াত আমরা সামনে রাখতে চাই। সূরা বাকারার ৬০ আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ.

"আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ কর। দুনিয়াতে ফাসাদ বা বিবাদ বিসম্বাদ সৃষ্টিকারী হয়ো না।"

সূরা আ'রাফের ৩১ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ج

www.bjilibrary.com

"খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ কর কিন্তু অপচয় কর না।"

এখানে একটি আয়াতে ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি না করে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের তাকিদের মধ্যে পরোক্ষভাবে যে শিক্ষাটি পাই তাহলো এ নিয়ে যেন মানুষের সমাজে কোনো অঘটন না ঘটে।

পরবর্তী আয়াতে প্রয়োজনীয় খাবার ও পানীয় গ্রহণের নির্দেশের সাথে অপচয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারীর বিষয়টি খুবই প্রণিধানযোগ্য। একদিকে সমাজের কিছু ব্যক্তির হাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য সামগ্রী থাকার কারণে তারা বঞ্চিতদের প্রয়োজন পূরণে কার্পণ্য প্রদর্শন করলেও অপচয় করতে মোটেও দ্বিধা করে না। এমনি অনেক দেশে তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য সামগ্রী উদ্বৃত্ত থাকা সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত গরীব ও পিছিয়ে পড়া দেশের অভুক্ত মানুষের খাবারের চাহিদা পূরণের পরিবর্তে বাজার ধরার জন্য অপচয়ও করে আবার খাদ্য নিয়ে নোংরা রাজনীতি করে থাকে। আল কুরআনের নির্দেশনা এদের সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ব্যক্তিগতভাবে হোক আর এক সাথে অনেকে মিলে হোক খাবারের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রসূলের পছন্দনীয় কিছু নিয়ম নীতি আছে যা অনুসরণ করলে মানুষের সমাজে একটি মার্জিত ও রুচিসম্মত আচার-আচরণ গড়ে উঠতে পারে। আমরা এক্ষেত্রে রসূল সা.-এর কয়েকটি হাদীস থেকে দিক নির্দেশনা নেয়ার চেষ্টা করব।

হযরত ওমর বিন আবি সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শৈশবে রসূল পাক সা.-এর ঘরে তাঁর প্রত্যক্ষ দেখা শোনায় মানুষ হয়েছি। একদিন আমার হাত দু'টি একটি খাবারের থালায় (খাবার) নাড়াচাড়া করছিল। রসূল সা. দেখে বললেন, হে বৎস! বিসমিল্লাহ বলে খাবার শুরু করো। ডান হাত দিয়ে খাও, খাবার পাত্রের তোমার কাছের দিক থেকে খাবার গ্রহণ কর।" হাদীসটি বুখারী এবং মুসলিম দু'টি প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে অভিন্ন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস থেকে আমরা খাবারের আদব প্রসঙ্গে তিনটি শিক্ষা পাই। এক ঃ আল্লাহর নাম নিয়ে অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলে খাবার শুরু করতে হবে। দুই ঃ ডান হাত দিয়ে খেতে হবে। তিন ঃ খাবারের পাত্রের যত্রতত্র থেকে খাবার না নিয়ে নিজের নিকট থেকে এবং নিজের নিকটের পাশ থেকে খাবার গ্রহণ করতে হবে। এখানে নিজের খাবারের পাত্র থেকে খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে এটা যেমন প্রযোজ্য, তেমনি একইভাবে এক সাথে অনেকে মিলে খাবার গ্রহণের সময়

www.bjilibrary.com

সকলের জন্য বা একসাথে কয়েকজনের জন্য রাখা পাত্র থেকে খাবার নিজের পাত্রে নেয়ার সময়ও এ নিয়মটাই অনুসরণ করতে হবে। এটা যেমন সকলের প্রতি সম্মানবোধ ও বিবেচনা বোধের পরিচয় বহন করে, তেমনি মার্জিত, পরিশিলীত ও ভদ্রজনচিত ব্যবহারেরই প্রতিফলন ঘটায়। পক্ষান্তরে এর বিপরীত হলে সেটা অন্যের মনে বিরক্তিকর ভাবের সৃষ্টি করতে পারে। একত্রে সংরক্ষিত বা সাজানো খাবারের সৌন্দর্য সৌকর্যও নষ্ট করতে পারে।

আর ডান হাতে খাওয়াটাই মানব প্রকৃতির কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য এবং রুচিসম্মত তথা বিজ্ঞানসম্মত এবং স্বাস্থ্য সম্মতও হওয়ার কথা। কারণ মানুষের বাম হাতের ব্যবহার সাধারণত যে কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেটা সকলের জানা। এরপর পাশ্চাত্যে কেন বাম হাতের ব্যবহার হয়ে আসছে খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে এটা মোটেই বোধগম্য নয়। আল্লাহ ও রসূল সা. প্রদর্শিত শিক্ষার বিপরীত করাটাই যদি তাদের সভ্যতার দাবি হয়ে থাকে তাহলে এ ব্যাপারে আমাদের বলার কিছুই নেই। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো, মুসলিম নামধারী সোস্যাল এ্যালিটদের মধ্যে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসারীদেরও আমরা হাদীসে রসূল নির্দেশনার বিপরীত আচরণ দেখে বিস্মিত হই। তারা বিভিন্ন পার্টিতে বাম হাতে খাবার গ্রহণ করে নিজেদের প্রগতিশীল প্রমাণের প্রয়াস চালানোর এই কুরুচীপূর্ণ আচরণ দুঃখজনক।

হযরত আনাস রা. বর্ণিত হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম উভয় হাদীসগ্রন্থে এভাবে উল্লেখিত হয়েছে ঃ রসূল সা.-এর খেদমতে কিছু পরিমাণ দুধ পেশ করা হলো, পরিমাণে কম থাকায় তাতে কিছু পানি মিশানো হলো, (কারণ রসূলের একার জন্য আনা হয়েছিল, অথচ তাঁর পাশে আরো দু'জন ব্যক্তি ছিলেন। রসূলের ডান পাশে বসা ছিলো একজন বেদুঈন এবং বাম পাশে বসা ছিলেন হযরত আবু বকর রা.। আধুনিক প্রোটোকল অনুসরণ করলে, সামাজিক মান মর্যাদা অনুযায়ী রসূল সা.-এর পরে হযরত আবু বকরকে উক্ত দুধ পানের জন্য অগ্রাধিকার দেয়ার কথা। কিন্তু আল্লাহর রসূল সা. তার ডান দিকে বসা বেদুঈনকে আগে দিলেন এবং হযরত আবু বকর রা.-কে পরে দিলেন। যেহেতু তিনি বাম দিকে ছিলেন। আর ইসলামী সংস্কৃতির দাবি হলো সবকিছুই ডান দিক থেকে শুরু করা। এখানে রসূল সা. বেদুঈনকে অগ্রাধিকার দিয়ে কারণটাও উল্লেখ করলেন যে, ডান দিক থেকে শুরু করতে হবে।

www.bjilibrary.com

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। রসূল সা. উটের মতো এক নিঃশ্বাসে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন, বরং দুই বারে অথবা তিনবারে পানি পান করতে বলেছেন। সেই সাথে এটাও বলেছেন, বিসমিল্লাহ বলে পানি পান শুরু করবে, আর শেষ করে আলহামদুলিল্লাহ পড়বে। হাদীসটি তিরমিযি শরীফে উল্লেখিত হয়েছে।

খাবারের ক্ষেত্রে তিরমিযি শরীফে বর্ণিত একটি হাদীস বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য এবং অধিকতর স্বাস্থ্যসম্মত ঃ "আবি কারামাল মেকদাম ইবনে মা'দিকারাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সা.-কে বলতে শুনেছি ঃ "আদম সন্তান যেন উদর পূর্তি করে খাবার গ্রহণ না করে, ক্ষুধা নিবৃতির জন্য যতোটুকু নূন্যতম প্রয়োজন তাই যথেষ্ট মনে করে। তার পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য, বাকী শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখবে।"

ইবনে মাজায় বর্ণিত একটি হাদীসে অপচয়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আল্লাহর রসূল সা. বলেছেন, যা কিছু খেতে মন চায় বা মনে আগ্রহ সৃষ্টি হয়, অবলিলাক্রমে তাই গ্রহণ করাটাই অপচয়ের শামিল।

খাদ্য ও পানীয় বস্তুতে ফুঁক দেয়াকে আল্লাহর রসূল সা. নিষেধ করেছেন, রসূল সা.-এর এই নিষেধটি খুবই বিজ্ঞানসম্মত এবং স্বাস্থ্যসম্মত।

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে, যখন রাতের খাবারের আয়োজন করা হয় আর সে সময়ই যদি ইশার নামাযের সময় উপস্থিত হয়, তাহলে আগে রাতের খাবার খেয়ে তারপর ইশার নামায আদায় করতে হবে।

সামষ্টিকভাবে খাবারের ক্ষেত্রে আল্লাহর রসূল সা.-এর যে সৌজন্যমূলক আচরণের তাকিদ তাও একটি রুচিশীল সমাজের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। ইবনে মাজা হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, যখন খাবারের জন্য দস্তরখান বিছানো হয় এবং তাতে খাদ্য সাজানো হয় সেই খাবার মজলিসে অংশগ্রহণকারী কেউ দস্তরখানা (খাবার শেষে) না উঠানো পর্যন্ত কারও উঠা উচিত নয়। আর নিজের খাবার শেষ হলেও অন্যদের খাবার শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিজের খাবারের পাত্র থেকে হাত গুটিয়ে নেবে না। নেহায়েত প্রয়োজনে উঠতে হলে ওজর পেশ করে নিতে হবে। কারণ মজলিসে কোনো কোনো ব্যক্তির আগে আগে খাবার শেষ হবার কারণে অন্যরা অপমানিত বোধ করতে পারে। হয়তোবা কারো কারো খাবারের চাহিদা থেকেও যেতে পারে।

www.bjilibrary.com

খাবার শেষের দোআ সম্পর্কে আমাদের সকলের জানা থাকার কথা। যা মূলত আল্লাহর শোকর গোজার বান্দা হবার এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাওয়াক্কুল বৃদ্ধির সহায়ক।

মুসলিম শরীফের একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই। হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "আমি রসূল সা.-কে বলতে শুনেছি, যখন কোনো ব্যক্তি (দিনের কাজ শেষে বা অন্য কোনো স্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করত) নিজ বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করে প্রবেশকালে এবং খাবারের সময়ে, তখন শয়তান তার সাথী-সঙ্গিদেরকে বলে, এ বাড়ীতে তোমাদের রাত যাপনেরও সুযোগ নেই। রাতের খাবারে শরীক হওয়ারও কোনো সুযোগ নেই। আর যদি এর বিপরীতে প্রবেশকালে আল্লাহর নাম স্মরণ না করে, শয়তান তার সাথীদের বলে, এ বাড়ীতে রাত যাপনের সুযোগ হলো এবং খাবারের সময় যদি আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে তাহলে শয়তান তার সাথীদের ডেকে বলে, এ বাড়ীতে রাতের খাবারে অংশ গ্রহণেরও সুযোগ পেলে।" (মুসলিম শরীফ)

ঈমানদারের দিনরাত এবং চলাফেরা সবসময় আল্লাহর যিকিরে থাকার উপরে মূলত তাকিদ দেয়ার জন্যই রসূল এই নির্দেশটি দিয়েছেন। দৈনন্দিন কার্যক্রমের মধ্যে আল্লাহকে স্মরণ রেখে চলাও ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা সূরা জুমআয় এক পর্যায়ে বলেন, "নামায শেষে আল্লাহর যমীনে ছড়িয়ে পড়ো, আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো, অর্থাৎ হালাল জিবিকা অর্জনের চেষ্টা করো, আর বেশী বেশী করে আল্লাহর যিকির করো।" এই যিকির আনুষ্ঠানিক বা সার্বক্ষণিক যিকির। যার প্রক্রিয়া আল্লাহর প্রিয় রসূল সা. আমাদেরকে শিখিয়ে গেছেন।

শয্যা গ্রহণের সময় কি দোয়া পড়তে হবে, শয্যা ত্যাগের সময় কোন্ দোআ পড়তে হবে, সফরে যেতে কি দোআ পড়তে হবে। যান বাহনে যমীনে স্থল বা আকাশ পথে ভ্রমণের সময় কি দোয়া পড়তে হবে। এমন কি পায়খানা পেশাবের আগে কি দোয়া পড়তে হবে। আর পেশাব-পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় কি দোআ পড়তে হবে তাও শিখিয়েছেন। যাতে আমরা সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকি।

www.bjilibrary.com

পোশাক পরিচ্ছদের আদব

পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও আল্লাহর নির্দেশনা এবং তার রসূলের নির্দেশনা মেনে চলার উপর মানুষের সামাজ ও সভ্যতার সৌন্দর্য ও সৌকর্য বৃদ্ধি পায়। আর এটা লংঘিত হলে সভ্যতা-সংস্কৃতির নামে, প্রগতিশীলতা ও আধুনিকতার নামে সামাজিক অনাচার-কদাচার-দুরাচারের প্রাদুর্ভাব ঘটবে বরং বাস্তবে ঘটেও থাকে।

ইসলামী জীবন বিধান মানুষের স্বভাব ধর্ম হিসেবেই অধিকতর পরিচিত। মানুষের সহজাত প্রবৃদ্ধি ও স্বভাব-প্রকৃতির সাথে এর রয়েছে একটি সুন্দর সমন্বয় ও সাজুয্য। ইসলামে পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে প্রথম বিবেচ্য বিষয় মানুষের লজ্জা নিবারণের নূন্যতম ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। লজ্জা নিবারণের ক্ষেত্রে পুরুষের জন্য এবং নারীদের জন্য প্রাকৃতিক গঠন প্রণালীর দৃষ্টিতেই ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে। সকল কৃত্রিমতা পরিহার করে পুরুষ ও নারী উভয়কেই একে মানতে হবে।

পোশাকের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় মানুষের সৌন্দর্য বা সৌন্দর্য বৃদ্ধি এমনভাবে যেন তাকে ভদ্র সমাজে একজন মার্জিত রুচিবান মানুষ হিসেবেই মনে করা হয়। কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়ে অতিভদ্র সাজারও কোনো প্রয়োজন নেই। আবার কৃত্রিমভাবে নিজেকে ফকির দরবেশ হিসেবে মানুষের কাছে উপস্থাপনও গ্রহণযোগ্য নয়। সর্বোপরি কথা পোশাক পরিচ্ছদের ঈমানদারী বা তাকওয়া পরহেজগারীর একটা স্বাভাবিক ছাপ থাকতে হবে। যা সকল প্রকারের কৃত্রিমতা এবং অতিরঞ্জন থেকে মুক্ত হতে হবে। এ সম্পর্কে সূরা আরাফের ২৬ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন ঃ

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ط وَلِبَاسُ التَّقْوٰى لا ذٰلِكَ خَيْرٌ ط ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ـ

"হে আদম সন্তানগণ! আমি তোমাদের জন্য এমন পোশাক সামগ্রির ব্যবস্থা করে দিয়েছি যা যুগপতভাবে তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং তোমাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে থাকে। সেই সাথে ব্যবস্থা করে

www.bjilibrary.com

তাকওয়ার পোশাক (কলুষমুক্ত চারিত্রিক ভূষণ) যা সর্বোত্তম। এসব আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অংশ বিশেষ যাতে করে এরা আল্লাহকে স্মরণ রাখতে সক্ষম হয়। (সূরা আল আ'রাফ ঃ ২৬)

সেই সাথে সূরা আ'রাফেরই ৩১ আয়াতটিও লক্ষণীয়। আল্লাহ বলেন ঃ

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ -

"হে আদম সন্তান! মসজিদে (নামায উপলক্ষে) প্রত্যেকবার হাজিরা দেয়ার সময় অপেক্ষাকৃত সুন্দর পোশাক পরিধান করে হাজির হবে।"

আমরা সাধারণত অফিস আদালতে বা যার যার কর্মক্ষেত্রে যাবার সময় সাধারণ ব্যবহার্য পোশাক রেখে অপেক্ষাকৃত সুন্দর পোশাক পরিধান করেই অভ্যস্ত। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানাদীতে যেতেও একই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকি, কোনো উপরস্থ কর্মকর্তা বা সম্মানিত ব্যক্তির সাথে দেখা সাক্ষাতের সময়েও এর ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু অনেককেই দেখা যায় নামাযের সময় এ দিকটাকে তেমন গুরুত্ব দেয় না। অথচ নামাযের মাধ্যমে মসজিদে উপস্থিতি ঈমানদার মানুষের জন্য সর্বোচ্চ সুমহান ক্ষমতার অধিপতি আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়াকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়ার কথা।

এ ব্যাপারে আমরা প্রিয় নবী সা. এর কয়েকটি হাদীসকে সামনে রাখলে বিষয়টির গুরুত্ব আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি ঃ

ছয়টি সহীহ হাদীস গ্রন্থের অন্যতম গ্রন্থ নাসায়ী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। "একদা এক ব্যক্তি রসূল সা.-এর দরবারে উপস্থিত হলো, তার পরনে ছিলো একটি মাত্র কাপড়। রসূল সা. তাকে জিজ্ঞেস করলেন। তোমার কি ধন-সম্পদ আছে ? ব্যক্তি উত্তরে বললো, হ্যাঁ আছে। রসূল সা. আবার প্রশ্ন করলেন, কেমন সম্পদ ? উক্ত ব্যক্তি উত্তরে বললো "আল্লাহ আমাকে সব ধরনের ধন-সম্পদ দান করেছেন।" রসূল সা. অতঃপর বললেন, আল্লাহ যখন তোমাকে ধন-সম্পদ দিয়েছেন তখন তোমার উপর উক্ত নেয়ামতের এবং প্রদত্ত সম্মানের প্রকাশ ও প্রতিফলনও হওয়া উচিত।

আবু দাউদ শরীফের একটি হাদীসে আল্লাহর রসূল সা. প্রশ্ন আকারে বলেছেন, "তোমাদের যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন তার জন্য জুমআর দিনে দৈনন্দিন কাজে কর্মে ব্যবহৃত কাপড়ের পরিবর্তে দুই কাপড় ব্যবহার করা কি কোনো কঠিন ব্যাপার ?

www.bjilibrary.com

অবশ্য পুরুষের জন্য রেশমের তৈরী পোশাক ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। তেমনি সোনা রূপার অলংকার ব্যবহার থেকে পুরুষদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। এগুলো কেবল নারীদের জন্য বৈধ।

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রসূল সা. বলেছেন, তোমরা রেশমের পোশাক ব্যবহার করো না, সন্দেহ নেই যারা দুনিয়ায় এটা ব্যবহার করবে তারা আখেরাতে এ থেকে বিরত থাকবে।"
(বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি রসূল সা.-কে দেখলাম তিনি এক হাতে (ডান) রেশম এবং অপর হাতে (বাম) স্বর্ণ নিয়ে বললেন, এ দুটি জিনিস আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে।"(আবু দাউদ)

তিরমিযী শরীফে হযরত আবু মূসা আশয়ারী বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, রসূল সা. বলেছেন, "রেশম এবং স্বর্ণের ব্যবহার আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে এবং নারীদের জন্য হালাল করা হয়েছে।"

www.bjilibrary.com

অসুস্থ ব্যক্তির সেবা শুশ্রূষার আদব

এ বিষয়ে কিছু আলোচনার আগে আমরা রসূল সা.-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীসকে সামনে রাখতে চাই ঃ

"হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সা. বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি রুগ্ন ছিলাম কিন্তু তুমি আমার সেবা শুশ্রূষা করনি। বান্দা বলবে, তুমি রব্বুল আলামীন, তোমার সেবা আমি কিভাবে করতাম। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল ? অথচ তুমি তার সেবা করনি। এটাকি তুমি জানতে না যে, যদি তার সেবা করতে তাহলে সেখানে তুমি আমাকে পেয়ে যেতে। অতপর আল্লাহ বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খানা খেতে চেয়েছিলাম। তুমি আমাকে খানা খাওয়াওনি। বান্দা বলবে, হে রব! তোমাকে কি করে খানা খাওয়াব, তুমিতো রব্বুল আলামীন ? আল্লাহ বলবেন, কেনো, তুমি কি এটা জানতে না যে আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খানা চেয়েছিল, অথচ তুমি তাকে খানা দাওনি। যদি তাকে তুমি খানা খেতে দিতে তাহলে সেখানে অবশ্যই আমাকে পেতে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, আমি তোমার কাছে পিপাসার্ত অবস্থায় পানি চেয়েছিলাম। তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। বান্দা বলবে, হে আমাদের রব, তোমাকে কি করে পানি পান করাবো ? তুমি তো রব্বুল আলামীন! আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না আমার অমুক বান্দাহ পিপাসার্ত হয়ে তোমার কাছে পানি চেয়েছিলো। তাকে পানি দিলে সেখানেই আমাকে পেয়ে যেতে।"

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অনুসারীদেরকে দুইটি হক (অধিকার) আদায় করতে হয়, যার একটিকে বলা হয়। 'হক্কুল্লাহ' বা আল্লাহর অধিকার। অপরটিকে বলা হয় বান্দার অধিকার বা হাক্কুল ইবাদ। উপরোক্ত হাদীসের তাৎপর্য উপলব্ধি করলে দেখা যায় বান্দার হক আদায় করাও আল্লাহর হক আদায় করার শামিল। অসুস্থ বান্দার সেবায় আত্মনিয়োগ করলে সেখানে আল্লাহকে পাওয়া যায়, ক্ষুধার্ত বান্দাকে খাবারের ব্যবস্থা করলে সেখানেও আল্লাহকে পাওয়া যায় আবার পিপাসাকাতর কোনো

www.bjilibrary.com

আল্লাহর বান্দাকে পানি পান করালে সেখানেও আল্লাহকে পাওয়া যায়। অতএব খালেক বা স্রষ্টার ইবাদাত এবং সৃষ্টির সেবা এক ও অভিন্ন সূত্রে গাঁথা। ইসলামী জীবনাদর্শের বাস্তব প্রতিফলনের মাধ্যমেই এর যথার্থ মূল্যায়ন হতে পারে।

বুখারী এবং মুসলিম শরীফের উভয় হাদীস গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, এক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের অধিকার ছয়টি ঃ

১. সালামের জবাব প্রদান করা।

২. দাওয়াত কবুল করা।

৩. যখন সে তোমার কাছে শুভেচ্ছা ও কল্যাণ কামনা করবে, তাকে তা প্রদান করবে।

৪. কেউ হাঁচি দিলে তার উপর আল্লাহর রহমত কামনা করে দোআ করা।

৫. রুগীর সেবা শুশ্রূষা করা।

৬. জানাযায় অংশগ্রহণ ও অনুসরণ করা।

বুখারী শরীফের অপর একটি হাদীসে হযরত আবু মূসা রা. বর্ণনা করেছেন, রসূল সা. বলেছেন, "রুগ্ন ব্যক্তির সেবা করো। ক্ষুধার্তকে খাবার দাও এবং কারাবন্দীকে মুক্ত করো।"

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত বুখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখিত হাদীসে বলা হয়েছে, রসূল সা. তার পরিবারের কোনো রুগ্ন ব্যক্তির গায়ে ডান হাত বুলিয়ে দিতেন এবং বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَذْهِبِ الْبَاْسَ، رَبَّ النَّاسِ اِشْفِ وَاَنْتَ الشَّافِيْ لَاشِفَاءَ اِلَّا شِفَائُكَ، شِفَاءً لَايُغَادِرُ سَقَمًا.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সা. একজন বেদুইন রুগীকে দেখতে গেলেন। যাকে দেখতে যান তার কাছে পৌঁছেই বললেন ঃ لَا بَاْسَ طَهُوْرٌ اِنْشَاءَ اللّٰهِ

হযরত আবু আবদুল্লাহ ওসমান ইবনে আবিল আস রা. থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ মুসলিম শরীফে উল্লেখিত হাদীসটিতে বলা হয়েছে, তিনি হযরত রসূল সা.-এর কাছে এসে তার শরীরের কোথাও ব্যাথা-

www.bjilibrary.com

বেদনা বা কষ্টের কথা জানালেন, রসূল সা. তাকে বললেন, তোমার শরীরের যে অংশে কষ্ট পাচ্ছ সেখানে হাত রাখ এবং তিনবার বিসমিল্লাহ বলার পর সাতবার এই দোআটি পড়তে থাক ঃ

اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ.

"আল্লাহ তায়ালার ইজ্জত ও কুদরতের মাধ্যমে ঐসব কিছুর অকল্যাণ থেকে পানাহ বা আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর যেসবের কষ্ট আমি পাচ্ছি এবং যেসবের কষ্টের আশংকা করছি।"

কয়েকটি হাদীসের তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য আমাদের সকলের সামনেই সবসময় পাথেয় হিসেবে থাকা দরকার ঃ

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الصِّحَّةَ وَالْفَرَاغَ نِعْمَتَانِ مِنْ نِعَمِ اللّٰهِ . مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ . رواه البخارى

"হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সা. বলেছেন, দু'টি এমন বড়মাপের নেয়ামত আছে, যাকে অধিকাংশ মানুষ উপেক্ষা করে থাকে, এর একটি হলো সুস্থতা আর অপরটি হলো অবসর সময়।"(বুখারী)

পরবর্তী হাদীসটি আরো বাস্তবসম্মত এবং প্রণিধানযোগ্য। হযরত আবু হুযাইফা ও ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সা. হযরত আবুদ দারদা এবং সালমানের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে দিয়েছিলেন। অতপর একদিন হযরত সালমান রা. হযরত আবুদ দারদা রা.-এর সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে তার স্ত্রী উম্মে দারদাকে অস্ত্র প্রহরের কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত কাপড়ে দেখতে পান এবং তাকে এ অবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করলে উত্তরে উম্মে দারদা বলেন, আপনার ভাই আবুদ দারদার দুনিয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ইতিমধ্যে হযরত আবুদ দারদা রা. এসে উপস্থিত হন এবং হযরত সালমান রা.-এর সামনে কিছু খাবার পেশ করে বললেন, আপনি খান, আমি রোযা আছি। সালমান রা. বললেন, আপনি না খেলে আমি কিছুতেই খানা গ্রহণ করবো না, অতপর তিনি খাবার গ্রহণ করলেন। অতপর রাত হলে আবুদ দারদা রাত জেগে নামাযে রত হলেন। সালমান রা. তাকে বললেন, ঘুমিয়ে যাও। অতপর তিনি ঘুমালেন। আবার জেগে উঠলেও তাকে ঘুমাতে বললেন। আবারও তাকে সালমান রা.

www.bjilibrary.com

ঘুমাতে বললেন। অবশেষে রাতের শেষ প্রহরে হযরত সালমান রা. হযরত আবু দারদা রা.-কে বললেন, এখন ঘুম থেকে জেগে উঠো। অতপর তারা এক সাথেই নামায আদায় করলেন।, অতপর হযরত সালমান রা. হযরত আবুদ দারদা রা.-কে বললেন, "সন্দেহ নেই তোমার রবের জন্য তোমার উপর অধিকার আছে, তোমার নফসের জন্যও তোমার উপর অধিকার আছে। তোমার পরিবার পরিজনের জন্য তোমার উপর অধিকার আছে। অতএব প্রত্যেক হকদারের হক (অধিকার) আদায় করো।" অতপর নবী সা.-এর নিকট এসে এই অবস্থা বর্ণনা করলে, রসূল সা. বললেন, সালমান ঠিকই বলেছে। (বুখারী)

ইসলাম আমাদের ব্যবহারিক জীবনের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত বাস্তবসম্মত জীবন বিধান, যেখানে বৈরাগ্যবাদের কোনো স্থান নেই।

হযরত আবু উবায়দা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে জানতে পেরেছি, তিনি বলেছেন, রসূল সা. মানুষের জন্য ১০টি বিষয়ে দৃষ্টি দিতে এবং বাস্তবে পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন ; এর মধ্যে পাঁচটি মানুষের মাথার ও মুখমণ্ডলের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর পাঁচটি তার গোটা শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট। মাথাসহ মুখমণ্ডলের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় পাঁচটি হলো মাথার চুল সুবিন্যস্ত করে রাখা (দাড়ির ব্যাপারেও এটি একইভাবে প্রযোজ্য) মোচ ছোট করা বা ছোট রাখা। মেসওয়াক করা বা দাঁত পরিষ্কার রাখা। ভালোভাবে কুলি করা (গড় গড়ার মাধ্যমে মুখের ভেতরটা পরিষ্কার রাখা) নাক ছাফ করা। আর বাকী পাঁচটি শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় হলো ঃ দুই হাতের বগলের নীচের লোম পরিষ্কার করা (কেটে ফেলা) হাত পায়ের আংগুলের নখ কাটা, নাভির নীচের লোম কেটে পরিষ্কার করা, খাতনা করানো, এবং পেশাব পায়খানা করে পাক পবিত্র থাকার চেষ্টা করা।" হাদীসটি কোনো প্রসিদ্ধ কিতাবে উল্লেখিত না হলেও এর বর্ণনাকারী হযরত আবু হুরায়রার বরাত দিয়েছেন, যিনি রসূলের খুবই প্রিয় সাথী এবং নিকটতম সাহচর্যের সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছেন। হাদীসটি উল্লেখিত হয়েছে মুসনাদে ইমাম আরবাইন নামক হাদীস গ্রন্থে। শুধু তার নয়, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এটি প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা সংস্কৃতির অংশ হিসেবে বিতর্কহীনভাবে অনুসৃত হয়ে আসছে।

ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনকে পরিচ্ছন্ন ও কলুষমুক্ত রাখাই ইসলামী জীবন যাপনের বা ইসলামী আদব ও আখলাক মেনে চলার মূল

www.bjilibrary.com

লক্ষ্য। উপরের হাদীসের আলোকে যেসব লোক নিজেদের ব্যক্তি জীবনকে পরিপূর্ণ রাখতে প্রয়াস পাবে, তাদের পরিবারেও এর অনুসরণ হওয়াটাই স্বাভাবিক। এভাবে পরিচ্ছন্ন, পরিশিলীত ও পরিমার্জিত ব্যক্তি, পরিবারের সমষ্টি হবে যে সমাজের ভিত্তি, সেই সমাজ সুসভ্য মার্জিত সভ্যতা সংস্কৃতির ধারক বাহক হবে এতে সন্দেহ সংশয়ের কোনো অবকাশই থাকতে পারে না। আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতার নামে যারা উপরোল্লিখিত হাদীসের শিক্ষাকে উপেক্ষা করে জীবন যাপন করে অভ্যস্ত, তারা আর যাই হোক মার্জিত বা পরিশিলীত রুচীর পরিচয় দিতে পারেন না, দেয়া সম্ভব নয়।

ইসলামে রুগীর সেবা যত্নের ব্যাপারে যেমন গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, তেমনি সময়মত চিকিৎসা গ্রহণের উপরও তাকিদ দেয়া হয়েছে। আল্লাহর রসূল সা. বলেছেন, আল্লাহ যতো রোগ ব্যাধি দিয়েছেন। তেমনি রোগ ব্যাধির প্রতিশেধক এবং নিরাময়ের উপায়-উপকরণ দিয়েছেন। হয়তো এ সম্পর্কে কেউ জানে আবার কেউ জানেনা।

সুস্থ লোক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাবার কথা যেমন বলা হয়েছে তেমনি কোনো অসুস্থ লোক যেন কোনো সুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি না করে সে ব্যাপারেও আল্লাহর রসূল সা. আমাদেরকে সতর্ক এবং সাবধান করেছেন। সংক্রামক ব্যাধি কোথাও দেখা দিলে সেখানে যেতে যেমন নিষেধ করা হয়েছে তেমনি সেখানকার লোকদেরকেও অন্যত্র যেতে নিষেধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে রসূল সা.-এর শিক্ষা এবং সাহাবায়ে কেরামগণের উক্ত শিক্ষা নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ খুবই বিজ্ঞানসম্মত আচরণ এবং বাস্তবসম্মত কার্যক্রম হিসেবেই ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে এবং থাকবে।

এ প্রসঙ্গে বুখারী শরীফের একটি হাদীসের শিক্ষাকে আমাদের জীবনে ভালোভাবে কার্যকর করা দরকার। যার ফল দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের জন্য কল্যাণকর ও ফলপ্রসু হতে পারে।

হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সা. বলেছেন, দুটি বিরাট ও অমূল্য নিয়ামতের ব্যাপারে অধিকাংশ লোক উদাসীন। এর একটি হলো সুস্বাস্থ্য বা সুস্থতা অপরটি হলো অবসর সময়।

www.bjilibrary.com

এ হাদীসটি রসূল সা.-এর অন্য একটি নির্দেশনার পরিপূরক। রসূল সা. অন্য একটি হাদীসে বলেছেন, তোমরা পাঁচটি বিষয়কে পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে গুরুত্ব প্রদান করবে অর্থাৎ যথাযথ কদর করবে, মূল্যায়ন করবে। (১) মৃত্যুর পূর্বে হায়াতকে, (২) বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকালকে (৩) দারিদ্রের পূর্বে স্বচ্ছলতাকে (৪) অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে এবং (৫) ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়ের। উপরোক্ত হাদীসে এই হাদীসের ৫টি বিষয়ের মধ্য থেকে দু'টিকে মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত হিসেবে উল্লেখ করার সাথে সাথে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, অধিকাংশ মানুষই সময়মত এ দু'টি নিয়ামতের কদর করে না বা গুরুত্ব দেয় না। যথাযথভাবে এ দু'টি নিয়ামতের সঠিক ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা চান যে, তার বান্দাহগণ তার দেয়া প্রতিটি নিয়ামতের যথাযথ শুকরিয়া আদায় করুক। এ সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট ঘোষণাও রয়েছে ঃ

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ.

"যদি তোমরা শোকর গুজারী করো, তাহলে আমি তোমাদের জন্য আমার নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দিব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও (নিয়ামতের কদর করতে ব্যর্থ হও) তাহলে জেনে রেখ, আমার আযাব অতি ভয়ংকর।"

আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় বলতে বুঝায় নিয়ামতের সদ্ব্যবহার করা, যথাযথ কদর করা বা মূল্যায়ন করা। শারীরিক সুস্থতা একটি বড় মাপের নিয়ামত, এটা আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগীর জন্য যেমন সহায়ক, তেমনি নিজের, নিজের পরিবারের এবং বৃহত্তর মানব গোষ্ঠীর কল্যাণেও ব্যবহৃত হতে পারে, বরং হওয়া উচিত। এটাই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয়। কিন্তু মানুষ অবহেলা বসত এটাকে উপেক্ষা করে তাকে উদাসীনতার পরিচয় যেমন দিয়ে থাকে তেমনি এর অপব্যবহারও করে থাকে। আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগী ও তার সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়ক কাজে না লাগিয়ে যদি আল্লাহর নাফরমানীর কাজে লাগায় তাহলে সেটা হবে বড় রকমের নাশুকরী বা অকৃতজ্ঞতা। এমনিভাবে নিজের পরিবারের ও মানব সমাজের কল্যাণে কাজে না লাগিয়ে যদি অকল্যাণে ব্যবহার করে সেটাও হবে নাশুকরী এবং আল্লাহর এই বড় নিয়ামতের অবমূল্যায়ন বা অপব্যবহার যা মোটেও আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় নয়।

www.bjilibrary.com

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব

তিরমিযি শরীফের একটি হাদীসকে ভিত্তি করেই এ বিষয়ে আলোচনায় অগ্রসর হতে চাই। "হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সা. বলেছেন, তোমাদের উঠান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ, ইয়াহুদীদের অনুসরণ করো না। সন্দেহ নেই, আল্লাহ নিজে পূত পবিত্র এবং তিনি পবিত্রতাকেই পছন্দ করেন। তিনি নিজেই সবচেয়ে অধিকতর পরিচ্ছন্ন এবং পরিচ্ছন্নতাকেই পছন্দ করেন। তিনি দয়ালু, দয়াকেই পছন্দ করেন (অথবা তিনি নিজে মর্যাদাবান তাই অন্যকে মর্যাদা দেয়া পছন্দ করেন)। তিনি দাতা এবং দানকারীকে পছন্দ করেন। অতএব তোমাদের উঠান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ যাতে করে তোমাদেরকে ইয়াহুদীদের মত যেন নোংরা মনে না হয়।

ইসলামে স্বচ্ছতা পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতাকে অনেক বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এটা ব্যক্তি ও পরিবারের জন্য যেমন প্রযোজ্য তেমনি প্রযোজ্য আমাদের সমাজ জীবনের জন্য। পরিচ্ছন্নতাকে বলা হয়েছে ঈমানের অংশ। অর্থাৎ ঈমানের দাবি পূরণের একটি অপরিহার্য করণীয় কাজ। মানুষের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনকে পাপ পংকিলতা থেকে পূত-পবিত্র রাখা এবং যাবতীয় জঞ্জাল ও আবর্জনা তথা অপরিচ্ছন্নতা ও নোংরামি থেকে মুক্ত রেখে একটি সুন্দর জীবন যাপনের উপযোগী পরিবেশ ও পারিপার্শিকতা সৃষ্টির জন্যই আল্লাহর সর্বশেষ রসূল পরিচ্ছন্নতাকে ঈমানের অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, পরিচ্ছন্নতারও এক ডিগ্রি বহুগুণের গুরুত্বের দাবিদার হলো পবিত্রতা। সব পরিচ্ছন্নতাই কিন্তু পবিত্র নাও হতে পারে। কিন্তু সব পবিত্রতাই পরিচ্ছন্ন হতে বাধ্য। হাদীসে পরিচ্ছন্নতাকে বলা হয়েছে ঈমানের অংশ বিশেষ। আর পবিত্রতাকে বলা হয়েছে ঈমানের অর্ধেক।

পবিত্র জীবন যাপনই ইসলামী জীবন যাপনের মূল লক্ষ্য। এই পবিত্রতার সাথে পরিচ্ছন্নতা এবং স্বচ্ছতার সম্পর্ক ওতোপ্রোতভাবেই জড়িত। আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রাথমিক উপায় নামাযের জন্য শরীরের পবিত্রতার পাশাপাশি পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার ও নামাযের স্থান পবিত্র

www.bjilibrary.com

হওয়া অপরিহার্য। তেমনি মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রতিটি পদে পদে পরিচ্ছন্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ভিত্তিতে যেমন সমাজের পরিবেশ স্বাস্থ্য সহায়ক বা স্বাস্থ্য বান্ধব হয়ে থাকে, তেমনি মানুষের চলার পথের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করে। একটি হাদীস এ ব্যাপারে খুবই প্রণিধানযোগ্য। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূল সা. বলেছেন ঃ

اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ.

"ঈমানের শাখাসমূহ সত্তুরেরও অধিক। এর সর্বোত্তম শাখা হলো 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। নিরংকুশ ক্ষমতার মালিক তথা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী কোনো সত্তা নেই।' সর্বনিম্ন হলো রাস্তা ঘাটে পথিক বা পথচারীকে কষ্ট দিতে পারে এমন কোনো বস্তু সরিয়ে দেয়া। আর ধৈর্যশীলতা হলো ঈমানের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য শাখা।"

আমাদের উপর আমাদের নিকট আত্মীয় স্বজনের, প্রতিবেশীর এমনকি নিজের শরীরের পর্যন্ত হক বা অধিকার আছে, তেমনি আল্লাহর রসূল সা.-এর ভাষায় মানুষের চলাচলের রাস্তা ঘাটেরও অধিকার আছে। আর সেই অধিকার হলো মানুষের চলার পথে বাধা বিঘ্ন সৃষ্টিকারী বস্তুকে সরিয়ে দেয়া।

চলাচলের পথে বাধা বিঘ্ন সৃষ্টিকারী যে কোনো জিনিস সরিয়ে দেয়া যেমন ঈমানের অন্যতম দাবি, তেমনি রাস্তাঘাটে মানুষের এমন জীব-জন্তুর চলাচলে বাধা সৃষ্টি করার মতো, নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার মতো কোনো কিছু ফেলাও ঈমানের পরিপন্থী কাজ হিসেবেই পরিগণিত হবে। যেমন কেউ যদি রাস্তায় পানি ফেলে আর এই কারণে কোনো ব্যক্তি বা প্রাণী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে ইসলামী ফিকাহবিদদের দৃষ্টিতে যার পানি ফেলার কারণে এমনটি ঘটবে তাকে এর দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে।

www.bjilibrary.com

জানাযায় অংশগ্রহণ, সমবেদনা জ্ঞাপন ও কবর যিয়ারত

মানুষ ইন্তেকাল করলে তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে সম্মিলিতভাবে দোআ করার একটি উত্তম প্রক্রিয়া হলো সালাতুল জানাযা। এটাকে শরীয়তের দৃষ্টিতে ফরজে কেফায়ার মর্যাদা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সবার পক্ষ থেকে কিছু লোক সালাতুল জানাযা আদায় করলে অন্যদের উপর আর কোনো দায়-দায়িত্ব বর্তায় না। তবে কেউ না করলে সবাইকে ফরজ কাজে অবহেলা প্রদর্শনের বা ফরজ তরক করার দায় বহন করতে হবে। এখানে উল্লেখ করতে চাই, ফরজে কেফায়ার অজুহাতে জানাযার নামায থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা কখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ফরজ আমল সেটা ফরজে আইন হোক আর কেফায়া হোক যে কোনো সুন্নাত নামক মুস্তাহাব আমলের তুলনায় অনেক বেশী উত্তম এবং সওয়াবের। তাছাড়া জানাযা শুধু একটা ফরজ (কেফায়া) আমলই নয়। এটা একজন মুসলিম নর-নারীর অধিকার অপর মুসলিম ভায়ের উপর।

জানাযায় অংশগ্রহণকারীকে নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ করানো এটি একটি বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা। জানাযায় পঠিত মূল দোআটি খুবই প্রণিধানযোগ্য ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ.

উপরোক্ত দোআটির দিকে আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই এটি একটি সার্বজনিন এবং সার্বিক দোআ, যার অর্থ হলো ঃ

"হে আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা জীবিত তাদেরকে ক্ষমা করো, যারা মৃত তাদেরকে ক্ষমা করো। যারা উপস্থিত তাদেরকে ক্ষমা করো। যারা অনুপস্থিত তাদেরকেও ক্ষমা করো। ক্ষমা করো আমাদের মধ্যে যারা বয়জ্যেষ্ঠ তাদেরকেও আর যারা বয়োকনিষ্ঠ তাদেরকেও। আমাদের পুরুষদেরকেও ক্ষমা করো, নারীদেরকেও ক্ষমা করো।

www.bjilibrary.com

আমাদের মধ্যে যাদেরকে তুমি বাঁচিয়ে রাখ তাদেরকে ইসলামের উপর কায়েম রেখ, আর যাদের মৃত্যুর ফায়সালা করবে, তাদেরকে ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত রেখে মৃত্যুবরণ করার তৌফিক দিও।"

জানাযায় শরীক হবার ফজিলত সংক্রান্ত একটি হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি কোনো জানাযায় শরীক হয় সে সওয়াব পাবে এক কিরাত (পাহাড় তুল্য অধিক পরিমাণ) আর যে জানাযার নামাজ শেষে দাফন পর্যন্ত শরীক হবে সে সওয়াব পাবে দুই কিরাত সমপরিমাণ।

মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে উল্লেখ আছে। মৃত্যুপথের যাত্রী ব্যক্তিকে মৃত্যুর মুহূর্তে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর" তালকিন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে মৃত্যুপথের যাত্রী ব্যক্তিটি ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করতে পারে। মুসলিম শরীফের এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হযরত আবু সাঈদ আল খুদরী রা.।

বুখারী এবং মুসলিম শরীফের এই বিখ্যাত হাদীসের দুটি কিতাবেই হযরত আনাস রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি আমাদের সকলের সতর্কীকরণের জন্য যথেষ্ট। হাদীসের ভাষা অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং সুবিখ্যাত। রসূল সা. বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থানে নেয়ার মুহূর্তে তিনটি বস্তু অনুসরণ করে বা পিছে পিছে যায়। তার পরিবারবর্গের সদস্যগণ তথা অধিনস্থ বা অনুগামী লোকজন, তার মাল এবং আমল। অতপর ২টি বস্তু ফিরে আসে আর রয়ে যায় শুধু একটিই। ফিরে আসে তার পরিবার-পরিজন, দাফন করতে যাওয়া লোকজন এবং মাল সম্পদ, আর তার সাথে সম্বল হিসেবে থেকে যায় কেবল তার নিজের নেক আমলসমূহ।

"ঋণগ্রস্ত অবস্থায় কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার সম্পর্কে আল্লাহর রসূল সতর্ক করে বলেন, মু'মিন (মৃত) ব্যক্তির নফস তার ঋণের সাথে লটকানো অবস্থায় থেকে যায়, যতক্ষণ না তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করা হয়।" এই হাদীসটি হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত এবং তিরমিযি শরীফে উল্লেখিত হয়েছে।

মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরাইরা রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি আমাদের বিবেককে জাগ্রত রাখার জন্য এবং ঈমানের দাবি পূরণের জন্য সদা সহায়ক ভূমিকা পালন করতেও পারে। উক্ত হাদীসে রসূল সা. বলেন,

www.bjilibrary.com

"মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন থেকে তার আমল করার সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিন শ্রেণীর মানুষ এর ব্যতিক্রম। এক শ্রেণীর মানুষ তারা, যারা সাদকায়ে জারীয়া করে যায়। অপর শ্রেণীর মানুষ তারা, যারা মানুষের হেদায়াত লাভে সহায়ক ইলমী কোনো খেদমত করে যায়। অপর শ্রেণীর মানুষ তারা, যারা নেক সন্তান রেখে যায় এবং নেক সন্তান তাদের জন্য দোআ করতে থাকে।

www.bjilibrary.com

কবর যিয়ারত প্রসঙ্গে

মুসলিম শরীফে হযরত বুরাইদা রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রসূল সা. বলেন, "আমি ইতিপূর্বে তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করতাম। কিন্তু এখন অনুমতি দিচ্ছি। তোমরা কবর যিয়ারত কর।" অপর এক হাদীসে এর কারণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে, "যাতে করে তোমরা আখেরাতের কথা স্মরণ করতে পার।"

এই হাদীসের প্রথম দিকে কবর যিয়ারতের উপর নিষেধাজ্ঞার কারণ ছিল কবর পূজার মত শির্‌কে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখা। আর সঠিক পন্থায় অনুমতি দেয়া হয়েছে পূর্ববর্তী পর্যায়ের সতর্কবাণীকে সামনে রেখে কবর যিয়াতের মাধ্যমে আখেরাতের কথা স্মরণ করার জন্য। আখেরাতে নিজের অবস্থা কেমন হবে। এই চিন্তায় আখেরাতের জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের বা পাথেয় সংগ্রহের মন-মানসিকতা তৈরী করার সহায়ক হিসেবে কবর যিয়ারতকে গ্রহণ করাই রসূল সা.-এর পক্ষ থেকে আগের নিষেধাজ্ঞা পরিহার করে অনুমতি প্রদানের মূল লক্ষ্য। কবরবাসীর জন্য কবরস্থানে গিয়ে দোআ করলেও যা হবে কবরস্থানে না গিয়ে দোয়া করলেও তাই হবে। তবে কবরস্থানে গিয়ে যিনি দোআ করবেন, তার নিজের মৃত্যু চিন্তায় আখেরাতের পরিণাম পরিণতির চিন্তা যদি তার মনকে আন্দোলিত করে তবে এটা তার নিজেরই একটি বাড়তি ফায়দা বা লাভ হিসেবে বিবেচিত হবে।

মুসলিম শরীফের অপর একটি হাদীস হযরত বুরাইদা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। যাতে বলা হয়েছে যখন কেউ (কোনো ব্যক্তি বা দল) কবরস্থানের দিকে রওয়ানা করত (যিয়ারতের উদ্দেশ্যে) রসূল সা. তাদেরকে তাদের করণীয় সম্পর্কে এভাবে শিক্ষা দিতেন ঃ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ اِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ. اَسْئَالُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

"তোমরা কবরস্থানে পৌছে এই ভাষায় সালাম জানাবে, হে কবরবাসী মু'মিন ও মুসলমানগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

www.bjilibrary.com

ইনশাআল্লাহ আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হবো। আল্লাহর কাছে আমরা আমাদের নিজেদের নিরাপত্তা কামনা করি, কামনা করি তোমাদের নিরাপত্তাও।"

বড় বড় এবং নামিদামি লোকদের কবর যিয়ারতের তুলনায় সাধারণ মানুষের কবর স্থানে গিয়ে তাদের মনে করা অধিকতর নিরাপদ এবং ফলপ্রসূ হতে পারে। রসূলের পক্ষ থেকে একবার নিষেধ করে, আবার অনুমতি প্রদান করায় এমনটিই প্রতিয়মান হয়।

❐

www.bjilibrary.com

মসজিদের আদব

মসজিদ আল্লাহর ঘর এবং মুসলমানদের আত্মিক ও নৈতিক প্রশান্তি লাভের কেন্দ্র। মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে মসজিদের ভূমিকা জাগতিক সকল উপায় উপকরণের চেয়ে অধিকতর কার্যকর। আমাদেরকে মুসলমান হিসেবে আল্লাহর বান্দাহ ও রসূলের উম্মত হিসেবে যেমন আল্লাহর হক বা অধিকার আদায় করতে হয় তেমনি আল্লাহর বান্দা ও রসূলের উম্মতের হক বা অধিকারও আদায় করতে হয়। ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণের জন্য এই দুই ধরনের হক বা অধিকার আদায়ের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হলো আল্লাহর ঘর মসজিদ। এখানে আল্লাহর রসূলের একটি ছোট্ট অথচ অর্থ ও তাৎপর্যপূর্ণ বাণী আমরা সামনে রাখতে পারি। তিনি বলেছেন, كُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ وَاِخْوَانًا . "তোমরা এক আল্লাহর বান্দাহ হয়ে যাও, আর হয়ে যাও পরস্পরে একে অপরের ভাই।"

প্রতিদিন পাঁচবার নির্ধারিত সময়ে মসজিদে জামায়াতের সাথে নামায আদায়ের মাধ্যমে আমরা রসূল সা.-এর এই বাণীর দাবি পূরণ করতে পারি। এবং রসূল সা. তার উম্মতের মধ্যে সেই ঐক্য, সংহতি এবং ভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় বন্ধন গড়ার লক্ষ্যে এই উপদেশটি দিয়েছেন। সেই লক্ষ্য অর্জন করারও সর্বোত্তম মাধ্যম মসজিদে নির্ধারিত সময়ে একত্রে নামাজ আদায়। নামায শেষে পারস্পরিক কুশল বিনিময়, একে অপরের সুখ-দুঃখের খোঁজ খবর নেয়া এবং সূরা আসরের শিক্ষার আলোকে একে অপরের হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং বিপদে ধৈর্য্য ধারণের নসিহত করার। পরস্পরের কল্যাণ কামনায় এক অনবদ্য সুযোগ হয় এভাবে মসজিদ কেন্দ্রিক সামাজিক বন্ধন গড়ে তোলার মাধ্যমে।

এই মসজিদে আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে যথাযথ আদব রক্ষা করতে হবে। মসজিদ সম্পর্কীয় আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশনা সামনে রাখা সকলের জন্যই জরুরী—যারা আল্লাহর ঘর মসজিদের সঠিক মূল্যায়ন করতে আগ্রহী এবং যথাযথ মর্যাদা দিতে আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান।

এ সম্পর্কে সূরা জীনের ১৮ আয়াতটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ বলেন ঃ

www.bjilibrary.com

وَاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا.

"সন্দেহ নেই মসজিদ কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য, অতঃপর মসজিদে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ডাকবে না।"

সূরা আ'রাফের ২৯ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْا مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ .

"তোমরা মসজিদে হাজীরা দেবার প্রতিটি মুহূর্তে তোমাদের মুখমণ্ডল-সমূহকে সোজাভাবে আল্লাহর দিকে রুজু করবে এবং একমাত্র তাকেই ডাকবে। নিরংকুশভাবে কেবলমাত্র তারই সকল বিধি বিধানের প্রতি নির্ভেজাল আনুগত্য প্রকাশের জন্য।"

সূরা আ'রাফের ৩১ আয়াতের নির্দেশিকাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে আল্লাহ নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ.

"হে আদম সন্তানেরা! তোমরা প্রতিবারে নামায উপলক্ষে মসজিদে হাজিরা দেবার সময় সুন্দর পোশাকে সজ্জিত হয়ে যাবে।"

নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী উত্তম পোশাক পরেই মসজিদে বা কোনো স্থানে নামাযে শরীক হওয়ার উপর এখানে স্বয়ং আল্লাহ গুরুত্ব সহকারে নির্দেশ দিয়েছেন। নামায তো মু'মিনের মেরাজ। আল্লাহর সাথে দেখা সাক্ষাত ও কথাবার্তার একটা সুন্দরতম সুযোগ। হাদীসে 'ইহসান' সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ . فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ.

"আল্লাহর ইবাদাত (নামায ইবাদাতের বুনিয়াদি ব্যবস্থা) করো এমনভাবে যেন তুমি তাকে দেখছো, যদিও তোমার পক্ষে তাকে দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনিতো তোমাকে অবশ্যই দেখছেন।"

এ অনুভূতি ও মন মানসিকতা নিয়ে যদি কেউ আল্লাহর শাহী দরবারে হাজিরা দেয়ার জন্যই নামায উপলক্ষে মসজিদে যায়, তাহলে আল্লাহর দরবারে হাজীরা দেবার গুরুত্ব সামনে রেখেই তাকে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহারের কাপড় চোপড়ের পরিবর্তে সাধ্যানুযায়ী উত্তম ও সুন্দর পোশাক

www.bjilibrary.com

পরিধান করে যাওয়াটা আল্লাহর শানের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের অনিবার্য দাবি।

মসজিদে প্রবেশ করার এবং মসজিদ থেকে বের হবার জন্য আল্লাহর রসূল সা. সুন্দর দু'টি দোআ শিক্ষা দিয়েছেন। মসজিদের আদব রক্ষায় এ দোআ দু'টি বেশ সহায়ক। হযরত আবু উবায়েদ থেকে বর্ণিত। মুসলিম শরীফের হাদীসে বলা হয়েছে, রসূল সা. বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন বলে ঃ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. "হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার রহমতের দরোজাসমূহ খুলে দাও।"

বুখারী ও মুসলিম শরীফের এই দুটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থেই হযরত আবু কাতাদাহর বরাত দিয়ে উল্লেখ হয়েছে, রসূল সা. বলেছেন, "যখন তোমরা কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে, বসার আগে অবশ্যই দু'রাকআত নামায আদায় করে নিবে।"

মুখের দুর্গন্ধ অন্যকে কষ্ট দিতে পারে। অন্যের মনে বিরক্তি সৃষ্টি করতে পারে এমন কিছু গ্রহণ করে যেন কেউ মসজিদে না যায়, এ বিষয়ে একাধিক হাদীসে আল্লাহর রসূল সা. বেশ তাকিদের সাথে নিষেধ করেছেন। হেদায়াতের পরিপন্থী কোনো গান বা কবিতা পাঠ থেকেও নিষেধ করা হয়েছে। এমন কিছু হতে দেখলে নিষেধ করতে বলা হয়েছে। কারণ মসজিদ এজন্য তৈরী করা হয়নি।

মসজিদের আদব সম্পর্কে আবু দাউদ শরীফের একটি হাদীসের আলোকে কিছু কথা বলেই এ আলোচনার সমাপ্তি টানতে চাই।

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত আবু দাউদ শরীফে উল্লেখিত উক্ত হাদীসের মূল বক্তব্য হবে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَتَى الْمَسْجِدَ لِشَىْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সা. বলেছেন, যে যে বিষয়ের জন্য মসজিদে যায়, সে ব্যক্তি সেটাই তার ভাগে পেয়ে থাকে।"

www.bjilibrary.com

অর্থাৎ যে যে নিয়তে মসজিদে যায়, তার সে নিয়তের ভিত্তিতেই সে এর প্রতিদান পেতে থাকে। কেউতো মসজিদে যায় একটু বিশ্রাম গ্রহণ বা ঘুমানোর জন্য আবার কেউ বা যায় নামাজ বা ই'তেকাফের জন্য। অথবা সাদাকা করার জন্য। আমলের সওয়াব তো কেবলমাত্র নিয়তের উপর নির্ভর করে থাকে।

মসজিদকে আবাদ এবং জীবন্ত রাখার জন্য যেমন নির্ধারিত সময়ানুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত আযান ও ইকামতসহ জামায়াতে নামাজ আদায় অপরিহার্য। তেমনি মুসলিম জনগণের শিশুদের এবং অশিক্ষিত বৃদ্ধ বা বয়স্কদের ইসলামের বুনিয়াদী বিষয়ে শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা থাকাও অপরিহার্য। মসজিদ ঈমানদারের নৈতিক ও আত্মিক প্রশান্তি লাভের প্রাণ কেন্দ্র। আল্লাহর যিকির ও তার দ্বারে ধরণা দেয়া দুনিয়া এবং আখেরাতের কল্যাণ কামনার জন্য সর্বোত্তম স্থান। এক ওয়াক্ত নামাজ শেষে পরবর্তী ওয়াক্তের জন্য যার মনে প্রতিক্ষা থাকে প্রবল, মসজিদের বাইরে জাগতিক কোথাও গেলে অন্তরটা লেগে থাকে মসজিদের সাথে, সেই ব্যক্তি তো ঐ সাত শ্রেণীর ভাগ্যবান বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত, যারা কিয়ামতে আল্লাহর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় পাবে।

❐

www.bjilibrary.com

সফরের আদব

একটি আরবী প্রবাদ বাক্য আছে যার অর্থ হলো—"কোথাও সফরে যাবার আগে সফরসঙ্গী যোগাড় করে নাও" বুখারী শরীফের একটি হাদীস থেকে বুঝা যায়, আল্লাহর রসূল সা. একাকী সফর পছন্দ করতেন না। বিশেষ করে রাতে একাকী সফরকে ক্ষতিকর মনে করতেন। আবু দাউদ, তিরমিযি এবং নাসায়ী শরীফে বর্ণিত হাদীসের আলোকে বুঝা যায়, একাকী সফরতো পছন্দ করতেনই না এমনকি দু'জনের সফরকেও যথেষ্ট মনে করতেন না। তিনজনের একটা নূন্যতম কাফেলার সাথে সফরই ছিল রসূল সা.-এর পছন্দের। আবু দাউদ শরীফের অপর একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। যখন তিনজন একত্রে কোথাও সফরে যাবে তখন তাদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর বানিয়ে নিবে। এতে একদিকে যেমন সফরের সময়টা সুশৃংখলভাবে কাটানোর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তেমনি জামায়াতী জিন্দেগীর উপরও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

"একদিন এক রাতের সময় নিয়ে যদি কোনো সফরে যেতে হয়, সেই সফরে মহিলাদেরকে তাদের সাথে কোনো মুহাররাম পুরুষ ছাড়া সফর করতে আল্লাহর রসূল সা. নিষেধ করেছেন। আল্লাহর রসূলের নিষেধাজ্ঞা-জনিত এ হাদীসটি বুখারী এবং মুসলিম উভয় হাদীস গ্রন্থেই বর্ণিত হয়েছে বর্ণনাকারী হলেন হযরত আবু হুরাইরা রা.।

"সফরে নফল রোজা রাখার মধ্যে কোনো নেকী নেই।" (বুখারী)

"কোনো মুসলিম যদি কারো বাড়ীতে মেহমান হয় এবং অসুস্থ হয়ে যায়, তাহলে এ বাড়ীর লোকদের দায়িত্ব হবে তাদের মেহমানের (মুসাফির) সেবা শুশ্রূষা করা।" (তাহাবী)

সফরে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন বিঘ্নিত হবার কারণে নামাযে কষ্ট হয়ে থাকে। এজন্য আল্লাহ মুসাফিরের জন্য কছর নামাযের ব্যবস্থা করেছেন। হযরত আবু হুরাইরা রা. এ সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যে হাদীসটি বুখারী এবং মুসলিম শরীফে উল্লেখিত হয়েছে, তা হলো রসূল সা. বলেছেন, "সফর হলো আযাবের একটি অংশ। সফর সাধারণত তোমাদের খানা-পিনা এবং ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। যখনই

www.bjilibrary.com

তোমাদের সফরের লক্ষ্য অর্জিত হবে, সাথে সাথেই দ্রুততম সময়ের মধ্যে পরিবারের কাছে চলে যাবে।"

একজন মুসাফিরের জন্য রসূল সা. যে ভাষায় দোয়া করেছেন তাও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং প্রণিধানযোগ্য। হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূল সা.-এর নিকট এসে আবেদন করলো, হে আল্লাহর রসূল! আমি সফরে যাবার ইচ্ছা করছি, আমাকে এই সফরের কিছু পাথেয়র ব্যবস্থা করে দিন। রসূল সা. তার কথার প্রেক্ষিতে দোআর ভাষায় বললেন-

"আল্লাহ তোমাকে তাকওয়ার পাথেয় প্রদান করুন। লোকটি আবার বললো, আরো অধিক কিছু দিন, রসূল সা. বললেন, আল্লাহ যেন তোমার গুনাহ মাফ করে দেন। লোকটি এরপরও বললো, আরো অধিক কিছু দিন, উত্তরে রসূল সা. বললেন, তুমি যেখানেই থাকো না কেনো আল্লাহ যেনো তোমার জন্য ভাল কাজ করা সহজ করে দেন।" হাদীসটি তিরমিযি শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূল সা. যখন কোথাও সফরে রওয়ানা মুহূর্তে উটের পিঠে সোজা হয়ে বসতেন তখন তিনবার করে এই দোআটি পড়তেন ঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.

"সকল দোষত্রুটি থেকে মুক্ত এবং পূত পবিত্র ঐ সত্তা যিনি একে আমাদের অধীন করে দিয়েছেন। অন্যথায় আমরা একে আয়ত্বে আনতে পারতাম না। আর অবশ্য আমাদেরকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।"

উপরোক্ত দোয়াটি স্থল পথে এবং আকাশ পথে ভ্রমণের শুরুতে পড়া উচিত। আর জল পথের সফরের শুরুতে পড়া উচিত ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ الرَّحِيْمُ

"আল্লাহর নামে এর গতি এবং স্থিতি। অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং মেহেরবান।"

www.bjilibrary.com

স্থল ও আকাশ পথের উপরোল্লিখিত বিশেষ দোয়া এবং জল পথের জন্য উল্লেখিত বিশেষ দোআসহ উভয় পথের বা সব ধরনের সফরের শুরুতে আল্লাহর রাসূলের পছন্দের দোয়াটি নিম্নরূপ ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى ـ اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ ـ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ، وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ ـ وَكَابَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ،وَاِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ، وَزَادَ فِيْهِنَّ : اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ ـ راوه مسلم

"হে আল্লাহ! আমরা এই সফরে তোমার কাছে কামনা করি নেকী, তাকওয়া এবং এমন আমল যা তুমি পছন্দ করো। হে আল্লাহ! আমাদের সফরটা আসান করে দাও, এর দূরত্ব কমিয়ে দাও। হে আল্লাহ ! তুমি যে (বাড়ী ঘরে আমরা সফরে যাচ্ছি) সফরে আমাদের সাথী এবং বাড়ীতে পরিবার পরিজনদের জন্য প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! সফরকালে অবস্থিত অনাকাংখিত দুঃখ-কষ্ট ও রোগ-ব্যাধিকে এবং আমাদের পরিবার ও সন্তানের জন্য ক্ষতিকর কোনো কুনজর থেকে পানাহ চাই। সেই সাথে খারাপ অবস্থায় যেন পরিবার, সন্তান ও মাল-সম্পদের কাছে ফিরে আসতে না হয় সে জন্যও তোমার কাছে পানাহ চাই।"

সফর থেকে ফেরার পথে উপরোক্ত দোয়াই করতেন, সেই সাথে অতিরিক্ত যা বলতেন তার অর্থ হলো ঃ

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূল সা.-কে বললো, হে আল্লাহর রসূল সা.! আমি সফরে যাচ্ছি আমাকে কিছু উপদেশ দিন। রসূল সা. তাকে বললেন, তোমাকে অবশ্যই তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে। (আল্লাহর কাছে জবাবদিহির অনুভূতিসহ তাঁকে অন্তরে জাগরুক রাখতে হবে)। আর যখনই কোনো উঁচু জায়গায় উঠবে বা অতিক্রম করবে তখন 'আল্লাহু আকবার' বলবে। লোকটি চলে যাবার পর রসূল সা. তার জন্য এই ভাষায় দোয়া করলেন ঃ

www.bjilibrary.com

"আল্লাহ তার সফরের দূরত্ব কমিয়ে দিও এবং তার সফরটা সহজ সাধ্য করে দিও"। হাদীসটি তিরমিযি শরীফে উল্লেখিত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, সফরে উচু স্থানে উঠলে তাকবীর বলবে অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলবে, আর নীচুতে নামতে সোবহানাল্লাহ বলবে। (আবু দাউদ)

হযরত আবু মূসা আশয়ারী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা নবী করীম সা.এর সাথে সফরে ছিলাম। উক্ত সফরে যখন আমরা কোনো উপত্যকায় উপনীত হতাম তখন আমরা উচ্চৈস্বরে 'আল্লাহু আকবার' বলতাম এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর সাথে এমন উচ্চৈস্বরে আল্লাহু আকবার বলতাম। অতঃপর রসূল সা. আমাদের উদ্দেশে বললেন, "হে লোকেরা! তোমরা তোমাদের নিজেদের প্রতি সদয় আচরণ কর। (অর্থাৎ এত উচ্চৈস্বরে তাকবীর ও তাহলীলের দরকার নেই) তোমরা তো কোনো বধির বা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছো না। তিনিতো তোমাদের সাথেই আছেন। তিনিতো অতি নিকট থেকে সব কিছু শোনেন।" বর্ণিত হাদীস দু'টি প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ বুখারী এবং মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে অভিন্ন ভাষায়। সফরে দোয়া কবুল হবার শুভসংবাদও দিয়েছেন প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সা.। হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সা. বলেছেন, তিন ব্যক্তির দোয়া আল্লাহর দরবারে অবশ্যই কবুল হয়ে থাকে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই ঃ

এক. মজলুমের দোআ। দুই. মুসাফিরের দোআ। তিন. পিতার দোয়া পুত্রের জন্য (বা সন্তানের জন্য)। তিরমিযি শরীফে হাদীসটি সংকলিত হয়েছে।

সফরের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হাদীসটি বেশ প্রণিধানযোগ্য। এর একটি হাদীস তিরমিযি শরীফে উল্লেখিত হয়েছে, সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. লোকদেরকে বলতেন, সফরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলে আমার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে যেও, যাতে করে রসূল সা. যেভাবে আমাদেরকে বিদায় জানাতেন সেভাবে আমি তোমাদেরকে বিদায় জানাতে পারি। রসূল সা. বিদায় দেয়ার মুহূর্তে নিম্নোক্ত ভাষায় দোয়া করতেন ঃ

أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتِكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ.

www.bjilibrary.com

আরো কয়েকটি হাদীস বিবেচনার দাবি রাখে, সফরে দীর্ঘ দিন কাটাবার পর বাড়ী ফেরার ব্যাপারে।

(১)

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَطَالَ اَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلاَ يَطْرُقَنَّ اَهْلَهُ لَيْلاً.

"হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সা.বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ (সফর উপলক্ষে) দীর্ঘদিন পরিবার থেকে অনুপস্থিত থাকবে, সে যেন গভীর রাতে পরিবারের কাছে প্রত্যাবর্তন না করে।"

"অপর একটি বর্ণনা মতে রসূল সা. কোনো ব্যক্তির গভীর রাতে বাড়ীতে (বা পরিবারে) প্রত্যাবর্তন করতে নিষেধ করেছেন।" হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে।

(২)

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَطْرُقُ اَهْلَهُ لَيْلاً وَكَانَ يَاْتِيْهِمْ غُدْوَةً اَوْ عَشِيَّةً.

"হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সা. কখনও গভীর রাতে পরিবারের কাছে সফর থেকে ফিরতেন না। তিনি দিনের প্রথম ভাগের অথবা দিনের শেষভাগে প্রত্যাবর্তন করতেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

সফর শেষে বাড়ীতে বা পরিবারের কাছে ফেরার ব্যাপারে রসূলের মৌখিক নির্দেশনা এবং নিজের আমল দু'টোই খুবই বাস্তবসম্মত। দীর্ঘ দিন অনুপস্থিত থাকার পর অথবা দীর্ঘ সময় পরিবার থেকে দূরে থাকার পর গভীর রাতে প্রত্যাবর্তনটা পরিবারের জন্য বিব্রতকর হতে পারে। সবাই যদি গভীর রাতে ঘুমিয়ে পড়ে এমন সময় খোদ প্রত্যাবর্তনকারীর জন্যও এটা বিব্রতকর হতে পারে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর রসূলের মৌখিক নির্দেশনায় যেমন গভীর রাতে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, তেমনি তিনি বাস্তবে সফর থেকে নিজ পরিবারের কাছে কখন প্রত্যাবর্তন করতেন

www.bjilibrary.com

তারও উল্লেখ আছে। আর তা হলো হয় দিনের প্রথম প্রহর নতুবা দিনের শেষ প্রহর।" এখানে মূল বিবেচ্য বিষয় হলো নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের জন্য যেন কোনো বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় সেদিক লক্ষ্য রাখতে হবে।

সফর শেষে বাড়ী ফিরে আল্লাহর রসূল সা. প্রথমেই মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং দু'রাকআত নামাজ আদায় করতেন। হযরত কা'ব ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, বুখারী এবং মুসলিম উভয় হাদীস গ্রন্থেই এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

এখানে যাদের বাড়ীঘর মসজিদ সংলগ্ন নয় তারা নিজ বাড়ীতে দু'রাকআত নফল আদায় করে নিতে পারেন। সফর থেকে নিরাপদে ফিরে আসার জন্য আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানানোর উদ্দেশ্যে।

(৩)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ اَوْ فَدْفَدٍ كَبَّرَ ثَلاَثًا وَيَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّاللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَئٍْ قَدِيْرٌ. اٰيِبُوْنَ ـ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ ـ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ ـ متفق عليه ـ وَفِيْ مُسْلِمٍ اِذَا قَفَلَ مِنَ الْجُيُوْشِ اَوِالسَّرَايَا اَوِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.

"হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বুখারী ও মুসলিম হাদীসের প্রসিদ্ধ এই উভয় গ্রন্থেও বর্ণিত আছে। রসূল সা. যখন হজ্জ বা উমরা থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন কোনো উঁচু স্থান অতিক্রম কালে তিনবার করে 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। এরপর উপরের হাদীসে উল্লেখিত দোআটি পাঠ করতেন। মুসলিম শরীফে আছে–"যখন কোনো যুদ্ধ শেষে অথবা হজ্জ বা ওমরাহ শেষে প্রত্যাবর্তন করতেন। এই কথা-গুলো অতিরিক্তভাবে উল্লেখ আছে।"

www.bjilibrary.com

(৪)

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ اٰيِبُوْنَ. تَائِبُوْنَ. عَابِدُوْنَ ـ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُوْلُ ذٰلِكَ حَتّٰى قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ ـ رواه مسلم

"হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সা.-এর সাথে সফর থেকে ফিরছিলাম, এমতাবস্থায় মদিনার উপকণ্ঠে উপস্থিত হতেই রসূল সা. (হাদীসে উল্লেখিত) এ দোয়াটি পাঠ করতে থাকলেন এবং মদিনায় পৌঁছা পর্যন্ত দোয়া অব্যাহতভাবে পড়তে থাকেন।"

www.bjilibrary.com

সাধারণ আদব

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সা. বলেছেন, এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ছয়টি অধিকার আছে। (১) সালামের উত্তর প্রদান। (২) দাওয়াত কবুল করা (৩) যখন তোমার কাছে শুভেচ্ছা ও কল্যাণ কামনা করবে তাকে তা প্রদান করবে। (৪) কোনো ব্যক্তির হাঁচির সময় তার জন্য আল্লাহর রহমতের কামনা করে দোয়া করা। (৫) রুগীর সেবা করা (৬) জানাযায় অংশগ্রহণ করা।

"হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিরমিযি শরীফের হাদীসে বলা হয়েছে, যে মুসলিম ব্যক্তি জনমানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং এ ব্যাপারে কষ্ট সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয় সে ঐ ব্যক্তি থেকে উত্তম যে জনমানুষের সাথে মেলামেশা থেকে বিরত থাকে।"

মুসলিম শরীফের একটি হাদীস হযরত আবু যর রা. থেকে বর্ণিত। রসূল সা. বলেছেন, "কোনো ক্ষুদ্র নেক আমলকেও অবজ্ঞা করবে না। এমনকি তা যদি হাসি মুখে তোমার কোনো ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতও হয়।"

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। বুখারী মুসলিমে উল্লেখিত। তিনি বলেছেন, রসূল সা. বলেছেন, তিনজন একত্র হলে একজনকে বাদ দিয়ে দু'জনে কোনো কান কথা বলবে না, যতক্ষণ তোমরা মানুষের সাথে মেলামেশা করো। তখন এমনটিতে তাকে দুঃখ দিতে পারে।"

ইসলামী জীবন যাপনের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রসূল সা. যেসব আদব আখলাক অনুসরণের তাকিদ দিয়েছেন তা অত্যন্ত ব্যাপক। আমরা খুব সংক্ষেপে বিষয়টির আলোচনা শেষ করার চেষ্টা করছি। রসূলের সিরাত পুরোটাই সামনে রাখা জরুরী। কুরআনের কেন্দ্রীয় মূল বক্তব্যটা পাই আমরা সূরা আন নাহলের ৯০ আয়াতের মাধ্যমে, যাতে আদল এবং ইহসানের পাশে নিকট আত্মীয়দের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করার নির্দেশনা আছে। আদলের ব্যাখ্যায় হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজের সময়ের সবচেয়ে বড় আলেম ইমাম কুয়াইজর মতে "তোমার

www.bjilibrary.com

চেয়ে বয়সে যিনি বড় তাকে বাপের মত শ্রদ্ধা করো, যে ছোট তাকে সন্তানের মত স্নেহ কর। যে সমবয়সী তাকে ভাইয়ের মত ভালোবাস। অনুরূপ আচরণই করবে নারীদের বেলায় অর্থাৎ বয়স্কা নারীকে মায়ের সম্মান দেবে। সম বয়সীকে বোনের সম্মান দেবে। বয়কনিষ্ঠাকে নিজ কন্যার মতই মনে করবে। হাদীসের শিক্ষা অনুরূপ "রসূল সা. বলেন, যে ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

ইসলামী আদাবে জিন্দেগীর সঠিক আলোচনা ও বিশ্লষণে যে বিষয়টি প্রধান হিসেবে সামনে আসে তা হলো প্রত্যেকে একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। বিভিন্ন বয়সের ও শ্রেণীর পেশার মানুষের সুবিধা, অসুবিধা, মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক বিবেচনায় রেখে তাদের সাথে লেনদেন, আদান-প্রদান (Interaction) বা মোয়ামেলাত করতে হবে। এমনকি নামাযের ইমামতির দায়িত্ব যিনি পালন করবেন তাকে তার মোক্তাদীদের বয়সসহ সঠিক অবস্থার প্রতি বিবেচনাসহ ইমামতির দায়িত্ব আনজাম দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে নিম্নের হাদীসকে সামনে রাখতে হবে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰه عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرِ . وَاِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلْيُطِلْ مَا شَاءَ . متفق عليه

"হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রসূল সা. বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন মানুষকে সাথে নিয়ে নামায আদায় করবে তখন সংক্ষেপ করবে। কেননা তাদের মধ্যে দুর্বল-রুগ্ন ও বৃদ্ধ ব্যক্তি থাকতে পারে। হ্যাঁ, যখন একা নামায আদায় করবে তখন যত খুশী লম্বা করতে পারবে।"

হাদীসটিতে সকল পর্যায়ে মুক্তাদির অবস্থাকে বিবেচনায় রাখার জন্য ইমামকে নির্দেশ করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

ইসলামী আদাবে জিন্দেগীর ক্ষেত্রে দু'টি হাদীসের সতর্কবাণী

হাদীস গ্রন্থের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য দু'টিতেই এক যোগে অভিন্ন ভাষায় একটি হাদীস উল্লেখিত হয়েছে। অপরটি ঐ দু'টি হাদীস গ্রন্থের একটিতে উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ একটি হাদীস বুখারী এবং মুসলিম উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। অপরটি শুধু মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের বাস্তব জীবনের সামাজিক আচার-আচরণের ক্ষেত্রে হাদীস দু'টি খুবই অর্থবহ, তাৎপর্যপূর্ণ এবং বাস্তবসম্মত। ঈমানদার মাত্রই "সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য" এই কথায় বিশ্বাসী এবং সবকিছুর জন্য কেবল মাত্র আল্লাহর প্রশংসা করেই অভ্যস্ত। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো দিক কাউকে মুগ্ধ করলে ঈমানদার মানুষ তার জন্যও আল্লাহর হামদ বা প্রশংসা করে থাকে। এটাই ইসলামী শিক্ষার বাস্তব প্রতিফলন। আল্লাহর সৃষ্টির সেরা মানুষের কোনো ব্যাপারে কেউ মুগ্ধ হলে তার জন্যও মানুষের মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালারই প্রশংসা করবে এটাই স্বাভাবিক।

অবশ্য আল্লাহর নিয়ামতের জন্য তার শুকরিয়া জানানোর পাশাপাশি মানুষের কোনো উপকারের জন্য ধন্যবাদ জানাতে বাধা নেই। তবে এক্ষেত্রে মাত্রা জ্ঞানের পরিচয় দেয়া অপরিহার্য নতুবা যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হতে পারে। ক্ষতির কারণ হতে পারে ব্যক্তির জন্য ও সমাজের জন্যও। বড়কে শ্রদ্ধা করা, ভক্তি করা, যথাযথ সম্মান করা এবং ছোটকে স্নেহ করা রসূল সা.-এরই নির্দেশ। আর এমনটি করতে না পারলে রসূল সা.-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত-ই হওয়া যাবে না। এ ব্যাপারেও আল্লাহর রসূল সা. আমাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করেছেন। কিন্তু এই ভক্তি শ্রদ্ধা যেমন অন্ধ ভক্তি শ্রদ্ধার পর্যায়ে গিয়ে সীমালংঘনের কারণ ঘটাতে পারে, তেমনি কোনো মুরুব্বীর পক্ষ থেকে ছোট কাউকে অতিরিক্ত স্নেহকাতর হয়ে সেই মায়ামমতায় অন্ধ হয়ে অতিরিক্ত প্রশংসা করা ও অতিরঞ্জিত আবেগ উচ্ছ্বাসের প্রকাশ ঘটানোর ফলশ্রুতিতে তার স্নেহ ধন্য ব্যক্তিটির বড় রকমের সর্বনাশ হতে পারে, তার মধ্যে আত্মম্বরিতার জন্ম নেয়ার ফলে। এমনকি যিনি স্নেহকাতর কাউকে এভাবে প্রশংসা করে আকাশে তোলেন,

www.bjilibrary.com

এক সময় তার স্নেহধন্য এই ব্যক্তিটির আচরণ তার নিজের জন্য বিব্রতকর এবং চরম বিরক্তিকর হয়ে থাকে, বাস্তবে এমন ঘটনা চোখে দেখারও দুর্ভাগ্য হয়েছে। মানুষের ভালো কাজের স্বীকৃতি দেয়া সম্ভব নয়। প্রতিশ্রুতিশীল তরুণদের উৎসাহিত করা কোনো দোষের ব্যাপার নয়। কিন্তু এটা হতে হবে মাত্রা জ্ঞানের ভিত্তিতে একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে। সমাজে চাটুকারিতার প্রাধান্য মানুষের নফসকে মোটা করে থাকে। মানুষের ইগোকে শানিত করে থাকে। ব্যক্তি পূজা ও অন্ধ ভক্তি, অন্ধ আনুগত্যের পথ ধরে সমাজে অনেক অঘটন ঘটতে পারে। অতিরিক্ত প্রশংসা পেয়ে কোনো সম্ভাবনাময় তরুণ যুবকের মধ্যে অহংকারবোধ ও আত্মপূজার সর্বনাশা মনোভাবের জন্ম দিয়ে তার জীবনের ভবিষ্যতের সকল সম্ভাবনা নস্যাত হতে পারে।

সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণে তাই মানুষের সামনে প্রশংসা করা, মানুষের মুখে নিজের প্রশংসা শুনে পুলকিত হওয়া অনেক সম্ভাবনাময় ব্যক্তির জন্যই ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে।

মানুষের মনস্তাত্ত্বিক এই দিকটাকে সামনে রেখে রসূলে আকরাম সা.-এর হাদীস দু'টির তাৎপর্য অনুধাবন ও অনুসরণ করলে আমরা অনেক অঘটন থেকে ব্যক্তিগতভাবে রক্ষা পেতে পারি, সামষ্টিকভাবেও রক্ষা পেতে পারি। হাদীস দু'টির প্রথমটির ভাষা নিম্নরূপ ঃ

عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ اَثْنٰى رَجُلٌ عَلٰى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ وَيْلَكَ. قَطَعْتَ عُنُقَ اَخِيْكَ ثَلَاثًا مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا فَلْيَقُلْ اَحْسَبُ فُلَانًا اِنْ كَانَ يَرٰى اَنَّهُ كَذٰلِكَ وَلَا يُزَكِّىْ عَلَى اللّٰهِ اَحَدًا. ولفظ مسلم ولا ازكى على الله احدًا. متفق عليه

"আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী সা. -এর সামনে অন্য এক ব্যক্তির প্রশংসা করলেন। অতঃপর রসূল সা. (তার অনুভূতি প্রকাশ ঘটিয়ে) বললেন, তোমার জন্য ধ্বংস অপেক্ষা করছে। তুমিতো তোমার ভাইয়ের গর্দান কেটে ফেললে। কথাটি নবী সা. তিনবার উচ্চারণ করলেন। অতঃপর বললেন, তোমাদের মধ্যে

www.bjilibrary.com

যদি কেউ কাউকে প্রশংসা করতে দেখ তাহলে তাকে থামতে বলবে, আরো বলবে, যে ব্যক্তির যে গুণের জন্য প্রশংসা করছো এটা যদি তার মধ্যে থেকেও থাকে তাহলেও মনে রেখ আল্লাহ্র চেয়ে তো কেউ পবিত্র হতে পারে না। মুসলিম শরীফের উল্লেখিত হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহর থেকে বেশি পবিত্র কেউ হতে পারে না।"

হাদীসটি নিঃসন্দেহে সহীহ হাদীস। উক্ত হাদীস মানুষের সামনে প্রশংসা করাকে তার গর্দান কর্তনের সমতুল্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ সামনে প্রশংসা করা ঐ প্রশংসিত ব্যক্তিকে হত্যার শামিল। বাস্তবেই এরূপ প্রশংসার ফলশ্রুতিতে ঐ ব্যক্তির সম্ভাবনাময় যোগ্যতা ও প্রতিভার মৃত্যু হতে পারে, এতে কোনো সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই। ঈমানদার আল্লাহভীরু মুসলমানদের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ ইত্যাদি বলার অভ্যাস যদি অর্থ ও তাৎপর্যপূর্ণ বুঝে গড়ে উঠে তাহলে তারা ব্যক্তির সামনে তার প্রশংসা করে তার ক্ষতি করা থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখতে সক্ষম হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ মুসলিম শরীফে। হাদীসের ভাষা নিম্নরূপ ঃ

عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ رَاَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْثُوْا فِىْ وُجُوْهِهِمُ التُّرَابِ ـ رواه مسلم

"হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সা. বলেছেন, তোমরা যদি প্রশংসাকারী বা মানুষের গুণকির্তনকারী দেখতে পাও তাহলে তাদের মুখমণ্ডলে মাটি নিক্ষেপ করবে।"

এই হাদীসটির বক্তব্য আগের হাদীসের বক্তব্যের পরিপূরক। মানুষের সামনে প্রশংসাকে প্রশংসিত ব্যক্তিকে হত্যা করার শামিল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর পরবর্তী হাদীসটিতে এরূপ প্রশংসাকারীদেরকে নিবৃত করার জোর তাকিদ করা হয়েছে তাদের মুখমণ্ডলে মাটি বা ধুলা নিক্ষেপের নির্দেশের মাধ্যমে। এই কাজটি যে কত গর্হিত কাজ, মানুষের জন্য কত সর্বনাশা ক্ষতিকর কাজ, রসূল সা.-এর ভাষায় তার প্রকাশ ঘটেছে স্পষ্টভাবে। যার আর কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেরই প্রয়োজন হয় না।

www.bjilibrary.com

অথচ খুব দুর্ভাগ্যজনক এক রূঢ় বাস্তব সত্য হলো রসূল সা.-এর এই দু'টি কঠোর ভাষায় সতর্কবাণী মুসলিম উম্মার মধ্যে সাধারণভাবে আর দ্বীনি মহলে বিশেষভাবে উপেক্ষিত। শুধু উপেক্ষিত নয়, চরমভাবে এই সতর্কবাণীর বিপরীত আচরণই পরিলক্ষিত হয় সর্বত্র।

মানুষের সামনে কারো কৃতিত্বের জন্য অতিরঞ্জিত প্রশংসা করা এবং এমন প্রশংসায় পুলকিত হওয়া দুটোই দূষণীয় এবং ক্ষতিকর। দ্বীনি মহলের জন্য এটা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকর। এ ধরনের প্রশংসা শুনে যারা পুলকিত হয়, তাদের দ্বীনি কার্যক্রমের কোনো এক পর্যায়ে আত্মপূজার শিকার হওয়া, পদস্খলনের আশংকা অনেকটাই নিশ্চিত। দ্বীনি ব্যক্তিত্ব বা আধ্যাত্মিক ব্যক্তির জন্য অনুরোক্তদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আত্মপ্রশংসা শুনে পুলকিত অনুভব করলে ইবলিসী শক্তির সহজ শিকারে পরিণত হওয়ার আশংকা অনেকটাই অনিবার্য হয়ে ওঠে। দ্বীনি কার্যক্রমে অনেক ধাপ এগিয়ে আসে। অন্য কথায় সাফল্যের দ্বার প্রান্তে এসে নির্মম পদস্খলনের শিকার হওয়ার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্যজনক কিছু আর হতে পারে না। এভাবে সামনে প্রশংসা করা ও প্রশংসায় পুলকিত হবার ধারা যেখানে চালু হয় সেখানেই চাটুকারদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ফলে মানুষের আত্মসমালোচনার অভ্যাসের পরিবর্তে আত্মপূজারী ও আত্ম-প্রবঞ্চনার দ্বারা উন্মোচিত হয়, যার চূড়ান্ত পরিণতি জীবনের যাবতীয় নেক আমল বরবাদ হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ প্রসঙ্গে রসূল সা.-এর একটি ব্যাপক অর্থবোধক দোয়ার একটি ক্ষুদ্র অংশের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে আমার কথা শেষ করতে চাই। রসূল সা.-এর ব্যাপক অর্থবোধক সেই দোয়াটি নিম্নরূপ ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ وَالْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ وَالْعَيْلَةِ وَالذِّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ ـ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ وَالْفُسُوْقِ وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ، وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ ـ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبُكَمِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُزَامِ وَالْبَرَصِ وَسَيِّئِ الْاِسْقَامِ ـ الحاكم والبيهقى

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, জ্বরাগ্রস্ততা, নির্দয়তা, কর্মবিমুখতা, দারিদ্রতা,

www.bjilibrary.com

লাঞ্ছনা ও অর্থনৈতিক সংকীর্ণতা থেকে। আমি আরো আশ্রয় চাই, কপর্দকশূন্যতা, কুফরী, নাফরমানী, মতানৈক্য, নিফাকী, খ্যাতির প্রত্যাশা, লোক দেখানো মনোভাব থেকে। আমি আরো আশ্রয় চাই বধিরতা, বাকশক্তিহীনতা, মস্তিষ্কবিকৃতি, অন্ধত্ব, শ্বেতী ও অন্য কঠিন রোগ থেকে।"

উক্ত দোয়াটির একটি ক্ষুদ্র অংশ এখানে প্রসঙ্গক্রমে আমরা আলোচনা করতে চাই। আল্লাহর রসূল সা. এই দোয়ার মাধ্যমে অনেকগুলো অবাঞ্ছিত অনাকাংখিত বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়েছেন। এর মধ্যে মাত্র দু'টি বিষয়কে আলোচনায় আনতে চাই, একান্তই আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক হবার কারণে। আল্লাহর রসূলের দোআর ভাষায় একটি বাক্যে বেশ ক'টি বিষয় এক সাথে আসছে। এর একটি দারিদ্র, অপরটি কুফরী, এরপরে ফুসুক, শিকাক ও নিফাকের পরেই এসেছে সুমআত ও রিয়া থেকে পানাহ চাওয়ার কথা। এই একটি বাক্যে ৭টি বিষয়ের মধ্যে দারিদ্র সম্পর্কে ব্যাখার অপেক্ষা রাখে না। এটা মানুষকে কখনও কুফরীর পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে বলে আল্লাহর রসূল স্বয়ং সতর্ক করেছেন। এজন্য দারিদ্র (ফকর) থেকে পানাহ চাওয়ার সাথে সাথে কুফর থেকে পানাহ চেয়েছেন। ফিস্‌ক, শিকাক (দুর্ভাগ্য) ও মুনাফেকী থেকে পানাহ চাওয়ার পাশাপাশি সুমআত ও রিয়া থেকে পানাহ চেয়েছেন। এখানে সুমআত বলতে বুঝায় অপরের মুখে নিজের প্রশংসা শুনতে পছন্দ করা, নিজের প্রশংসা শুনে পুলকিত হওয়া প্রভৃতি। রিয়া অর্থ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নেক আমল করা। মানুষের প্রশংসা পাওয়ার জন্য নেক আমল করা। রিয়াকে শির্‌কে আসগার তথা ছোট শির্‌ক বা অপ্রকাশ্য শির্‌ক হিসেবেও অবহিত করা হয়ে থাকে। এই দু'টো মানসিক বা আত্মিক ব্যক্তি মানুষের সকল নেক আমল বরবাদ করে দেয়। হাদীসে উল্লেখ আছে, কিয়ামতের দিন প্রথম যে শ্রেণীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজির করবেন তারা হবে শহীদদের শ্রেণী। তাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত দেখিয়ে বলা হবে, তোমরা কি করে এসেছো। তারা উত্তরে বলবে, তোমার পথে লড়াই করে শাহাদাতবরণ করে এসেছি। আল্লাহ তাদেরকে বলবেন, মিথ্যা বলছো, তোমরাতো লড়াই করেছো এই উদ্দেশ্যে যে, লোকেরা তোমাদেরকে বীর হিসেবে প্রশংসা করবে। সে প্রশংসা তো পেয়ে এসেছো। এরপর তাদের আমল তাদের মুখের উপর ছুড়ে মারা হবে। আর তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে। এর পরের শ্রেণী হবে আলেম ও কারীদের, তাদেরকেও একইভাবে বলা হবে, কি করে

www.bjilibrary.com

এসেছো ? তারা এমন শিখা এবং শিখানো কুরআন পড়া ও পড়ানোর দাবি করলে তাদেরকেও বলা হবে মিথ্যা বলছো, এসবতো তোমরা করেছো এজন্য যে, লোকেরা তোমাদেরকে বড় আলেম ও কারী হিসেবে প্রশংসা করবে, সম্মান করবে। তাতো পেয়েছো। এই বলে তাদেরও আমল তাদের মুখের উপর ছুড়ে মারা হবে, আর তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে। তৃতীয় শ্রেণী হবে দাতাদের। তারাও আল্লাহর জিজ্ঞাসার জবাবে বলবে, হে আল্লাহ! তুমি যেসব পথে দান খয়রাত করা পছন্দ কর, তার কোনো একটি পথ বাদ দেইনি। আল্লাহ তাদেরকেও বলবে, মিথ্যা বলছো, এসব করেছো ঠিকই। কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল লোকেরা দাতা হিসেবে প্রশংসা করবে, তাতো পেয়েই আসছো। এরপর তাদেরও আমল তাদের মুখের উপর ছুড়ে মারা হবে। আর তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে।" এই হলো লোক দেখানো নেক আমল বা ইবাদত- বন্দেগীর পরিণতি। লোক মুখে প্রশংসা শুনে পুলকিত হওয়া অন্যের মুখে নিজের প্রশংসা শুনতে ভালো লাগার মতো রোগব্যাধি থেকে আল্লাহর রসূল রিয়াও (লোক দেখানো আমল) আগে উল্লেখ করায় পরিষ্কার হয় অন্যের মুখে নিজের প্রশংসা শুনে পুলকিত হওয়া নিজের কানে অন্যের মুখের প্রশংসাসূচক কথা শুনতে পছন্দ করা রিয়ার চেয়েও খারাপ। এখানে অপরের সামনে প্রশংসাকারী এবং প্রশংসিত ব্যক্তির এতে পুলকিত হওয়া দু'টো সমপর্যায়ের অবহিত আচরণ যা থেকে আল্লাহর রসূল সা. সতর্ক যেমন করেছেন তেমনি আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহও চেয়েছেন।

আল্লাহর রসূলের প্রতি ঈমান ও আকীদার অনিবার্য দাবি হলো, এই দু'টো আত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক রোগ-ব্যাধি থেকে নিজেকেও মুক্ত রাখার চেষ্টা করা অন্যকেও এমন ক্ষতিকর কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা।

সামনে প্রশংসার অভ্যাস মূলত চাটুকারিতার জন্ম দেয়। যা সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রেই পরিবেশকে দূষিত করে। এই রোগটি যেমন দ্বীনি মহলের জন্য ক্ষতিকর তেমনি ক্ষতিকর রাজনৈতিক ময়দানের জন্যও। সমাজ জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই চাটুকারিতা যেন পরিবেশ দূষণের সুযোগ না পায় সেজন্য আল্লাহর সর্বশেষ রসূল বিশ্ব মানবতার পথ প্রদর্শকের সতর্কবাণীকে পাথেয় হিসেবে সামনে রাখতে হবে সমাজের কল্যাণ কামনায় সবাইকে।

❐❐❐

www.bjilibrary.com

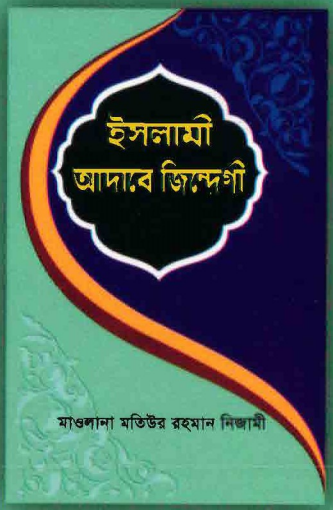

আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশ দাস লেন বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.adhunikprokashoni.com
www.facebook.com/adhunikprokashoni